وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-১০৩)
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-৩১৮)
কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক
আল-ইতিছাম
الاعتصام

ছফর-রবীউল আউয়াল ১৪৪৮ আগস্ট ২০২৬
Web : www.al-itisam.com



চীন ও আমেরিকার স্নায়ুযুদ্ধ : পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বঙ্গোপসাগরের নতুন ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK**
Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840
E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة:١٠، صفر و ربيع الأول ١٤٤٨هـ/أغسطس ٢٠٢٦م العدد:١٠،الجزء :١١٨
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير : فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৮ || ঈসায়ী ২০২৬ || বঙ্গীয় ১৪৩৩

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
আগস্ট-০১	ছফর-১৭	শনিবার	৪.০৬	৫.২৭	১২.০৫	৩.২৯	৬.৪২	৮.০৪
আগস্ট-০৫	ছফর-২১	বুধবার	৪.০৯	৫.২৯	১২.০৫	৩.৩০	৬.৩৯	৮.০১
আগস্ট-১০	ছফর-২৬	সোমবার	৪.১২	৫.৩১	১২.০৪	৩.৩০	৬.৩৬	৭.৫৭
আগস্ট-১৫	রবী. আউ.-০১	শনিবার	৪.১৫	৫.৩৩	১২.০৩	৩.৩০	৬.৩২	৭.৫২
আগস্ট-২০	রবী. আউ.-০৬	বৃহস্পতিবার	৪.১৮	৫.৩৫	১২.০২	৩.২৯	৬.২৮	৭.৪৭
আগস্ট-২৫	রবী. আউ.-১১	মঙ্গলবার	৪.২০	৫.৩৭	১২.০১	৩.২৮	৬.২৪	৭.৪২
আগস্ট-৩০	রবী. আউ.-১৬	রবিবার	৪.২৩	৫.৩৯	১২.০০	৩.২৭	৬.১৯	৭.৩৬

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	+২	+২	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	-১
নরসিংদী	-২	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-৩	-২	০
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩
ফরিদপুর	+৩	+৩	+২
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	+১	+১	০
গোপালগঞ্জ	+৪	+৪	+১
মাদারীপুর	+২	+২	০
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২
শরিয়তপুর	+২	+২	-১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-২	-১	+১
শেরপুর	-২	০	+৩
জামালপুর	০	+১	+৪
নেত্রকোনা	-৪	-৩	০

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-২	-৩	-৬
খাগড়াছড়ি	-৫	-৬	-১০
রাঙ্গামাটি	-৪	-৫	-৯
বান্দরবান	-৩	-৫	-১১
কুমিল্লা	-২	-২	-৪
নোয়াখালী	০	-১	-৪
লক্ষ্মীপুর	০	০	-৩
চাঁদপুর	০	০	-২
ফেনী	-২	-৩	-৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৪	-৩	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৯	-৭	-৪
সুনামগঞ্জ	-৭	-৬	-২
মৌলভীবাজার	-৭	-৭	-৫
হবিগঞ্জ	-৫	-৫	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৬	+৭	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৬	+৮	+১০
নাটোর	+৪	+৫	+৬
পাবনা	+৪	+৫	+৫
সিরাজগঞ্জ	+১	+২	+৪
বগুড়া	+৫	+৫	+৪
নওগাঁ	+৩	+৫	+৭
জয়পুরহাট	+২	+৩	+৭

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	০	+২	+৮
দিনাজপুর	+১	+৩	+৯
গাইবান্ধা	-১	০	+৪
কুড়িগ্রাম	-২	০	+৬
লালমনিরহাট	-২	+১	+৭
নীলফামারী	+১	+৩	+১০
পঞ্চগড়	+১	+৪	+১১
ঠাকুরগাঁও	+৩	+৫	+১১

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৬	+৫	+২
বাগেরহাট	+৬	+৫	০
সাতক্ষীরা	+৮	+৭	+৩
যশোর	+৬	+৬	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৪
ঝিনাইদহ	+৬	+৬	+৪
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭
মাগুরা	+৫	+৫	+৩
নড়াইল	+৫	+৪	+২

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+২	+২	-২
পটুয়াখালী	+৪	+৩	-২
পিরোজপুর	+৫	+৪	০
ঝালকাঠি	+৪	+৩	-১
ভোলা	+২	+১	-৩
বরগুনা	+৫	+৪	-১

■ সূত্র : ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org) ■ গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلة الإعتصام الشهرية

www.al-itisam.com

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

১০ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, আগস্ট ২০২৬ ইং,
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ছফর-রবীউল আওয়াল ১৪৪৮ হিজরী

উপদেষ্টা
শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রধান সম্পাদক
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
মো. আকরাম হোসেন
আব্দুল্লাহ মাহমুদ

বিভাগীয় সম্পাদক
মো: নাসির উদ্দিন, আল আমিন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মোঃ নাইমুল ইসলাম

ফাতাওয়া হটলাইন: ০১৪০৭-০২১৮৪২ সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সার্বিক যোগাযোগ
প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী, ৬২১০
সহকারী সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৯

সার্কুলেশন ম্যানেজার
০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০ বিকাশ মার্চেন্ট
monthlyalitisam@gmail.com

সূচিপত্র

» **সম্পাদকীয় ॥ ০২**
» **কুরআনের গভীরে**
সূরা ইউসুফ: হতাশাগ্রস্ত যুবকের জন্য আল্লাহর এক নীরব পাঠশালা ৩
-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক
» **প্রবন্ধ**
বিভিন্ন ইসলামী দল ও জামা'আতের সাথে যোগদান করার হুকুম (পর্ব-৪) ৭
অনুবাদ: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
আল-কুরআনে নৃতত্ত্ব: একটি বিশ্লেষণ ১২
-ড. এস এম আব্দুর রউফ
আল্লাহ তাআলার ১০টি গুরুত্বপূর্ণ নছীহত (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ১৪
পরিমার্জিত অনুবাদ: তাওহীদুর রহমান সালাফী
ঈদে মীলাদুন নবী: শারঈ মূল্যায়ন ১৭
মো. আকরাম হোসেন
জন্মদিন পালনের উৎপত্তি ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ১৮
-আহমাদ বিন আব্দুস সালাম
সমকামিতা: মানববিধ্বংসী পদক্ষেপ ১৯
-মেরাজুল ইসলাম প্রিয়
রাশিফল: মনস্তত্ত্ব, বাজারনীতি ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ২১
-নাফিউল হাসান
বন্যায় সাপের উপদ্রব: প্রয়োজন সতর্কতা ও সচেতনতা ২২
-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ
» **হারামাইনের মিম্বার থেকে**
দুনিয়ার ফিতনা থেকে সাবধান! ২৪
অনুবাদ: ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ
» **কুরআনের মর্মবাণী**
রবের বাণী ২৭
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
» **উসওয়াতুন হাসানাহ**
কুরআনুল কারীমের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভালোবাসা ২৯
-হাসান আল-বান্না মাদানী
» **ফাযায়েলে আমল**
সূরা আল-ইখলাছ, সূরা আল-কাফিরূন ও সূরা আল-মুলক পাঠের ফযীলত ৩২
-মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)
» **দিশারী**
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, অতঃপর... ৩৩
-রাকিব আলী
» **নারীদের পাতা**
মহিলাদের মসজিদে ছালাত আদায়: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ৩৫
-মো. মাযহারুল ইসলাম
» **হেলথ কর্নার**
হাম: লক্ষণ, জটিলতা ও প্রতিরোধে করণীয় ৩৮
-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ
» **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান**
ফিলিস্তীনের কান্না ৩৯
-খাশিউর রহমান বিন মনছূর আলী
» **কবিতা ॥ ৪১**
» **সংবাদ ॥ ৪২**
» **সওয়াল-জওয়াব ॥ ৪৪**



সম্পাদকীয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

চীন-আমেরিকার স্নায়ুযুদ্ধ: পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বঙ্গোপসাগরের নতুন ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা

সাগর যেমন একটি দেশের জন্য মহান আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত, তেমনি অনেক বড় চ্যালেঞ্জও। মাহানের (Mahan's Theory) তত্ত্ব অনুযায়ী একটি দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও উন্নয়ন অনেকাংশেই তার সমুদ্রশক্তির ওপর নির্ভর করে। আর এই কথার বাস্তব জ্বলন্ত প্রমাণ আমাদের চোখের সামনেই আছে। শুধু সমুদ্রবন্দরের সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুবাই ও সিঙ্গাপুর আজ বিশ্বের ব্যবসায়িক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে আফগানিস্তান, নেপাল ও ভুটানের মতো দেশগুলো শুধু সমুদ্র না থাকার কারণে অন্য দেশের ওপর চরমভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের জন্যও বঙ্গোপসাগর মহান আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত। তবে এটি চ্যালেঞ্জও। কেননা বাংলাদেশ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। আর বর্তমানে আমেরিকা ও চীনের স্নায়ুযুদ্ধ এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই চলমান।

ইন্দো-প্যাসিফিক (Indo-Pacific) হলো একটি ভূরাজনৈতিক ও কৌশলগত ধারণা, যা ভারত মহাসাগর (Indian Ocean) এবং প্রশান্ত মহাসাগর (Pacific Ocean) কেন্দ্রিক একটি সংযুক্ত কৌশলগত অঞ্চল। এই অঞ্চলের মধ্যেই মালাক্কা প্রণালি অবস্থিত। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য দেশগুলো হচ্ছে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া।

এই অঞ্চলের প্রায় সব দেশই অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও উন্নয়নশীল। আর এই অঞ্চলেই পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি জনগণ বসবাস করে, যাদের অধিকাংশই তরুণ। থুসিডাইডিস থিউরি অনুযায়ী রাইজিং পাওয়ার (Rising Power) ও ডিক্লাইনিং পাওয়ার (Declining Power)-এর মধ্যে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় যে শক্তির উত্থান ঘটছে, তার নাম চীন। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যে নিজের শক্তি ক্ষয় করা সুপার পাওয়ার আমেরিকা। চীনের এই উত্থান আমেরিকার জন্য হুমকি। তাই আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্য থেকে তার অধিকাংশ মিশন গুটিয়ে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে মনোনিবেশ করছে। আমেরিকা আফগানিস্তান ও সিরিয়া থেকে ইতোমধ্যেই সেনা প্রত্যাহার করেছে। এখন তার মনোযোগ শুধু রাশিয়া ও চীনের দিকে। ন্যাটোর মাধ্যমে এবং ইউক্রেন যুদ্ধের মাধ্যমে রাশিয়াকে ব্যস্ত রাখা হয়েছে। এখন বাকি আছে শুধু চীন। সেই লক্ষ্যে এই অঞ্চলের সকল দেশের সঙ্গে আমেরিকা সুসম্পর্ক গড়ে তুলছে। আর এমনিতেই এই অঞ্চলের অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক দুর্বল রয়েছে। যেমন তাইওয়ানের সঙ্গে যেকোনো সময় যুদ্ধ লেগে যাওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। ফলে আমেরিকা চারদিক থেকে এই অঞ্চলে তার উপস্থিতি বাড়াতে পারলে চীনকে চাপে রাখতে পারবে। প্রয়োজনে মালাক্কা প্রণালিও বন্ধ করে দিতে পারবে। আর এখানেই চলে আসে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের প্রয়োজন।

মালাক্কা প্রণালি বন্ধ হলে চীন যেন তার সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারে, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে চীনের অন্যতম একটি প্রকল্প বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI)। অতীতের সিল্ক রুটের ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে চীন এই প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে পাকিস্তানের গওয়াদার বন্দরে সিপেক (CPEC) প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, যেখান থেকে সরাসরি আরব সাগর হয়ে পণ্য চীনে যাবে। তেমনি শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দর ও মিয়ানমারের কিয়াউকফিউ (Kyaukphyu) বন্দরে চীনের বিশাল বিনিয়োগ রয়েছে। মিয়ানমারের এই বন্দরটি বাংলাদেশ থেকে মাত্র ২৫০ কিলোমিটার দূরে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরে চীন বাংলাদেশকে যে ইকোনমিক করিডোরের প্রস্তাব দিয়েছে, তা চট্টগ্রাম থেকে মিয়ানমার হয়ে কুনমিং পর্যন্ত যাবে। এই করিডোরে সংযুক্ত হওয়ার জন্য বাংলাদেশ থেকে মাত্র ২৫০ কিলোমিটার দূরের কিয়াউকফিউ বন্দর পর্যন্ত যুক্ত হলেই হবে। এই প্রকল্প সফল হলে বাংলাদেশের ভারতনির্ভরতা অনেক কমবে। পাশাপাশি ভারত মহাসাগরে চীনের উপস্থিতিও বাড়বে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ আমেরিকার সঙ্গে যে বাণিজ্যচুক্তি করেছে, সেখানে পরিপূর্ণরূপে আমেরিকার স্বার্থ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যদিও আমেরিকার সঙ্গে এই চুক্তিটি ছিল রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ থেকে বাঁচার জন্য। আমেরিকা পাল্টা ৩৭% শুল্ক আরোপ করেছিল। চূড়ান্ত চুক্তির পর সেটি ১৯%-এ নেমে এসেছে।

বাকি অংশ ৫৬ নং পেজে...

কুরআনের গভীরে

সূরা ইউসুফ: হতাশাগ্রস্ত যুবকের জন্য আল্লাহর এক নীরব পাঠশালা

-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক*

মানুষের অন্তরের গহিনে এমন কিছু স্বপ্ন নিঃশব্দে ঘুমিয়ে থাকে, যার কথা সে কারও কানে তুলে দিতে পারে না। কেননা সে স্বপ্নের আলো বড় স্নিগ্ধ, বড় ভঙ্গুর—লোকচক্ষুর কোলাহলে, পরিহাসের এক ঝাপটা হাওয়ায় তা নিভে যাওয়ার ভয় থাকে। জীবনের প্রভাতবেলায় মনে হয়, পথ বুঝি এক সরল রেখা—স্বপ্ন দেখব, পথে নামব, একদিন কাঙ্ক্ষিত তীরে গিয়ে পৌঁছব। অথচ পথ সামান্য বাঁক নিতেই ধরা পড়ে, স্বপ্নের সরণি কেবল ফুলে বিছানো নয়; সেখানে ওত পেতে থাকে অন্ধকার কূপ, অপবাদের কাঁটা, বাজারের নিষ্ঠুর শৃঙ্খল, কারাপ্রকোষ্ঠের স্তব্ধতা, নিকটজনের হিমশীতল ঈর্ষা আর সবার শেষে দাঁড়িয়ে থাকে দীর্ঘ প্রতীক্ষার সেই নীরব পরীক্ষা, যা মানুষের ধৈর্যকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত নিংড়ে নিতে চায়।

এই জীবন-সত্যেরই এক স্বচ্ছ দর্পণ যেন কুরআনের সূরা ইউসুফ, যার সম্মুখে দাঁড়ালে প্রতিটি ভগ্নহৃদয় মানুষ আপন মুখের ছায়া দেখতে পায়। স্বয়ং আল্লাহ এই আখ্যানের ললাটে এঁকে দিয়েছেন এক অপরূপ নাম ‘আহসানুল ক্বাছাছ’ অর্থাৎ সর্বোত্তম কাহিনি। আর সত্যিই তো, কুরআনের রীতি হলো এক সূরার বুকে নানা নবীর জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবি ছড়িয়ে রাখা—কোথাও এক টুকরো আলো, কোথাও এক ফোঁটা ছায়া; কেননা তার অভিপ্রায় নিছক গল্প বলা নয়, বরং প্রতিটি ঘটনার অন্তরাল থেকে পথের দিশা তুলে আনা। কিন্তু সূরা ইউসুফ যেন সেই নিয়মের মাঝেই এক স্নিগ্ধ ব্যতিক্রম। এখানে একটিমাত্র মানুষের জীবন, তাঁর শৈশবের স্বপ্ন থেকে পরিণত বয়সের সিংহাসন পর্যন্ত—আদ্যন্ত, অবিচ্ছিন্ন ধারায়, একখানা সূরার বুকেই ধরা দিয়েছে; যেন এক নিরবচ্ছিন্ন নদী, উৎস থেকে মোহনা অবধি একই খাতে বহমান।

আর এই কাহিনি নেমে এসেছিল এমন এক ম্লান প্রহরে, যখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন শোকের ভারে নত হয়ে পড়েছিল। সদ্য তিনি হারিয়েছেন তাঁর হৃদয়ের ছায়া প্রিয়তমা খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে, হারিয়েছেন স্নেহের অভিভাবক চাচা আবূ তালেবকে। চারিদিকে তখন কেবল শত্রুতার কাঁটা, প্রত্যাখ্যানের হিম, আর নিঃসঙ্গতার দীর্ঘ ছায়া। সীরাতের পাতায় সেই বেদনার কালকে বলা হয় ‘আমুল হুযন’ বা শোকের বছর। ঠিক সেই ক্রন্দনভেজা প্রহরে, আসমান থেকে এক প্রশান্তি ও ধৈর্যের বার্তা হয়ে নেমে এলো ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর এই আখ্যান—এমন এক মানুষের গল্প, যিনি কূপের অন্ধকার তলদেশ থেকে রাজত্বের দীপ্ত শিখর পর্যন্ত উঠে এসেছিলেন কেবল ধৈর্য আর আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থার পাথেয়টুকু বুকে নিয়ে।

তাই ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ঘটনাটি নিছক এক প্রাচীন ইতিহাসের জীর্ণ পুথি নয়; এটা মানুষের আত্মা ও অশ্রুর আলেখ্য, পরিবার ও সমাজের দর্পণ, যৌবন ও সংযমের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতা ও ক্ষমার মহাকাব্য। এর প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে মানুষ খুঁজে পায় নিজেরই প্রতিচ্ছবি, নিজের ভাঙন আর গড়ন, অপেক্ষা আর আর্তি, নীরব কান্না আর নিঃশব্দ সংগ্রাম; আর সব ছাপিয়ে সেই অদৃশ্য পরিকল্পনার সুদূর আলো, যে আলো অন্ধকারের বুক চিরে একদিন ঠিকই ভোর হয়ে ফোটে। এ যেন ভাঙা হৃদয়ের হাতে তুলে দেওয়া এক নিঃশব্দ মানচিত্র, যার প্রতিটি বাঁক ফিসফিস করে বলে যায়, হতাশ হয়ো না, তোমার এই রাত্রিরও এক নির্ধারিত প্রভাত আছে।

সূরা ইউসুফ শুরু হয় একটি স্বপ্ন দিয়ে। ছোট্ট ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর পিতা ইয়াকূব আলাইহিস সালাম-কে বলেন, ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ ‘হে আমার পিতা! আমি দেখেছি এগারোটি নক্ষত্র, সূর্য ও চাঁদ—তারা আমাকে সিজদা করছে’ (ইউসুফ, ১২/৪)।

একথা শোনার পর তার পিতা ইয়াকূব আলাইহিস সালাম তাকে একটি গভীর উপদেশ দিলেন, ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ‘তিনি

১. * ফারেগ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বানারাস, ভারত; বিএ (অনার্স), কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, জেদ্দা, সঊদী আরব।

www.al-itisam.com

বললেন, হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্ন তোমার ভাইদের কাছে বর্ণনা করো না; তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' *(ইউসুফ, ১২/৫)*।

সূরার সূচনাতেই ফুটে ওঠে এক নিবিড় শিক্ষা—জীবনের যে স্বপ্নটি আমরা লালন করি, তাকে কেবল চোখের কোণে একবার ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে যেতে দেওয়া নয়; বরং বুকের গভীরতম প্রকোষ্ঠে গেঁথে নিয়ে তার বাস্তবায়নের প্রতীক্ষায় বেঁচে থাকা। কিছুদিন হৃদয়ে একটি লক্ষ্য লালন করে, তারপর তাকে বিস্মৃতির ধুলায় ঢেকে দেওয়া মানুষের পক্ষে শোভা পায় না। বালক ইউসুফ যখন স্বপ্নে দেখলেন এগারোটি নক্ষত্র, সূর্য আর চাঁদ তার সম্মুখে নত হয়ে আসছে, পিতা ইয়াকূব আলাইহিস সালাম সে স্বপ্নকে শিশুসুলভ কল্পনা বলে উড়িয়ে দিলেন না; বরং সন্তানকে সাবধান করে তাকে ঠেলে দিলেন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথেই—এ কথা তোমার ভাইদের কাছে বলো না, পাছে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল বোনে *(ইউসুফ, ১২/৫)*।

এই একটিমাত্র সতর্কবাণীর ভেতরেই লুকিয়ে আছে যুগযুগান্ত পেরিয়ে আসা এক চিরন্তন উপদেশ। আজকের সেই তরুণ, যে তার প্রতিটি পরিকল্পনা, প্রতিটি অর্ধস্ফুট কাঁচা স্বপ্ন মুহূর্তের উচ্ছ্বাসে সমাজমাধ্যমের উন্মুক্ত আঙিনায় ছড়িয়ে দেয়—তার কানেও এই প্রাচীন আয়াত মৃদুস্বরে ফিসফিসিয়ে যায় এক সাবধানবাণী। সব সত্য সকলের কাছে উচ্চারণ করতে নেই, সব স্বপ্ন সব কানে নিরাপদ নয়; প্রতিটি পরিকল্পনাকে প্রকাশের আগে নিভৃতে পরিণত হতে দিতে হয়। স্বপ্ন গোপন রাখা কাপুরুষতা নয়—কখনো কখনো তা-ই প্রকৃত হিকমাহ তথা প্রজ্ঞার নীরব সাধনা। বীজ যে মাটির অন্ধকার বুকে লুকিয়ে থাকে বলেই একদিন মহীরুহ হয়ে আকাশ ছোঁয়; ডিমের খোলসের ভেতরে যে নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধে, তারই গর্ভ থেকে একদিন ডানা মেলে উড়ে যায় পাখি। মানুষের বড় স্বপ্নও তেমনি নীরবতার আঁধার গর্ভে ধীরে ধীরে প্রাণ পায়, তারপর সময় হলে আপন আলোয় ফুটে ওঠে।

অথচ ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর সেই স্বপ্ন সত্য হওয়ার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না; বরং এক বিস্ময়কর বিড়ম্বনায় স্বপ্ন পূরণের প্রতিটি ধাপ বাইরের চোখে ঠেকেছিল যেন স্বপ্ন ভেঙে পড়ারই একেকটি অধ্যায়। ভাইদের ষড়যন্ত্র, কূপের অন্ধকারে নিক্ষেপ, দাসের বেশে বিকিয়ে যাওয়া, পরের ঘরে প্রতিপালন, নারীর প্রলোভন, মিথ্যা অপবাদের কালিমা, কারাগারের নিঃসঙ্গ প্রহর, প্রিয়জনের বিস্মৃতি, আর তার উপরে দীর্ঘ, অন্তহীন মনে হওয়া প্রতীক্ষা। সব মিলিয়ে মনে হতেই পারে, এ জীবন বুঝি ক্রমাগত নিচের দিকেই গড়িয়ে চলেছে, ধাপে ধাপে আরও গভীর অতলে। কিন্তু আল্লাহর গোপন নকশায় এই প্রতিটি 'নিচে নেমে যাওয়া' আসলে ছিল আরও একবার 'উপরে উঠে আসার' নিঃশব্দ প্রস্তুতি, প্রতিটি অবরোহণ ছিল পরবর্তী আরোহণের সোপান।

এখানেই সূরা ইউসুফের গভীরতম পাঠ। আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে গড়ে তুলতে চান, তখন তিনি তাকে সদাসর্বদা আরামের মসৃণ সড়ক ধরে এগিয়ে নেন না; বরং কখনো তাকে ভাঙেন, কখনো কাঁদান, কখনো দীর্ঘ প্রতীক্ষায় দাঁড় করিয়ে রাখেন, কখনো অন্ধকারে নিভৃতে একা ফেলে রাখেন, কখনো-বা মানুষের চোখের সামনে অপমানের গ্লানিতে নত করেন—কেবল এজন্যই যে, লোকচক্ষুর কাছে যাকে তিনি ছোট করছেন, নিজের দরবারে তাকেই তিনি বড় করে তুলছেন। বাইরের এই অবনমন আসলে ভেতরের এক নিঃশব্দ উত্তরণ। যে অপমান আজ কাউকে ধুলায় নামায়, কাল সেই পথ ধরেই তার জীবনে নেমে আসে অপ্রত্যাশিত সম্মানের ভোর।

নিকটজনই কখনো নিকটতম শত্রু:

যে আঘাত সবচেয়ে গভীরে বাজে, তা প্রায়ই আসে সবচেয়ে কাছের মানুষের হাত থেকে। এটি সূরা ইউসুফের গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতামূলক শিক্ষাগুলোর একটি। ইউসুফ আলাইহিস সালাম সবার ছোট হওয়ার পরও তার ভাইয়েরা তাকে ভালোবাসত না; যেখানে স্বাভাবিকভাবে রূপ, গুণ ও ছোট হওয়ার কারণে তার প্রতি সবার স্নেহশীল হবার কথা ছিল। কুরআন তাদের মনের কথা তুলে ধরে, ﴿إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ 'তারা বলল, ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয়; অথচ আমরা বাবার বড় সন্তানেরা তো একটি শক্তিশালী দল। নিশ্চয়ই আমাদের পিতা স্পষ্ট ভুলের মধ্যে আছেন' *(ইউসুফ, ১২/৮)*।

হিংসা যখন হৃদয়ে ঢোকে, তখন মানুষ সত্যকে ভুলভাবে দেখতে শুরু করে। তারা পিতার স্নেহকে অন্যায় মনে করল, ছোট ভাইয়ের সৌন্দর্য ও সম্ভাবনাকে অপরাধ ভাবল, নিজেদের বঞ্চিত ভাবতে ভাবতে একদিন অন্যায়কে সমাধান মনে করল, অপরাধের রাস্তা বেছে নেওয়াকে নিজেদের জন্য নিরাপদ মনে করল। এরপর তারা বলল, ﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾ 'ইউসুফকে হত্যা করো অথবা কোথাও ফেলে দাও। তাহলে তোমাদের পিতার মনোযোগ শুধু তোমাদের দিকেই থাকবে' *(ইউসুফ, ১২/৯)*।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে হত্যার পরিকল্পনা করছে তার নিজ ভাইয়েরা। এখানে জীবনের কঠিন বাস্তবতা প্রকাশিত হয়েছে। মানুষের জীবনে অনেক সময় সবচেয়ে গভীর আঘাত আসে কাছের মানুষ থেকে। যে মানুষকে আমরা নিরাপদ ভাবি, কখনো সে-ই কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সূরা ইউসুফ আমাদের হতাশ হতে শেখায় না। আপনি আপনার জীবনে আপনার সবচেয়ে কাছের মানুষদের নিকট থেকে শত্রুতার জন্য প্রস্তুতি নেন। তবে এখানে একটি বিষয়—তাদের শত্রুতার বিপরীতে

www.al-itisam.com

আপনার ব্যবহার কী হওয়া উচিত? সেটাও আমরা ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর কাছে শিখব।

তবে যেটা আপনি আপনার জন্য বিপদ ভাবছেন, সেটা আল্লাহ তাআলা আপনার এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হিসেবে রাখেননি তো? ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইয়েরা ভেবেছিল, তারা তাকে সরিয়ে দিলে গল্প শেষ, অথচ আল্লাহ সেখানে গল্প শুরু করলেন।

কূপ: অন্ধকার সবসময় শেষ নয়

অবশেষে তারা ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে সঙ্গে নিয়ে ছাগল চরাতে গেল এবং কূপের অন্ধকারে ফেলে দিল। আল্লাহ বলছেন, ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ‘তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে কূপের অন্ধকারে ফেলার বিষয়ে একমত হলো, তখন আমি তার কাছে অহী করলাম, তুমি একদিন তাদেরকে তাদের এই কাজের কথা জানাবে; অথচ তারা বুঝতেও পারবে না’ (ইউসুফ, ১২/১৫)।

কূপে ফেলে দিয়ে তারা ভেবেছিল, তাকে তাদের ও পিতার মাঝখান থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পেরেছে; বাস্তবে তারা তাকে মিশরের পথে পাঠাচ্ছিল। তারা ভেবেছিল, তারা তার মর্যাদা কমিয়ে দিচ্ছে; বাস্তবে তারা তার ভবিষ্যৎ আলোকিত করার প্রথম বাতিটি প্রজ্বলিত করেছিল।

কূপ একটি অদ্ভুত প্রতীক, তাই না! চারপাশে দেয়াল, সামনে কোনো রাস্তা নেই। চিৎকার করলেও কেউ শুনবে না। তবে সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে উপরে আকাশ দেখা যায়—আলোকিত, নীল আকাশ, সাদা-কালো মেঘের ভেলায় সজ্জিত আকাশ; যদিও-বা সামান্যই দেখা যায়। হয়তো মাথার উপরে পাখিদের উড়তেও দেখা যায়। জীবনের সবচেয়ে আশাহীন মুহূর্তে দাঁড়িয়ে, আলোহীন গহিন অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদের মাঝে স্থির দাঁড়িয়ে থেকেও আকাশ দেখা ভোলা যাবে না। এই আকাশ থেকেই মুক্তির রাস্তা নির্ধারিত হবে। আকাশের বিশালতা হয়তো বেঁচে ফেরার স্বপ্ন দেখাবে।

পিতার স্নেহ থেকে আঁধার কূপে এসে পড়তে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর খুব বেশিক্ষণ লাগেনি। আপনার আনন্দময় জীবনও হুট করেই বিষাদের কালো ছায়ায় ঘিরে যেতে পারে। কিন্তু সফলতার কথা ভুলে যাওয়া যাবে না। কুরআন আমাদের দেখায়, আল্লাহর কাছে কোনো ‘শেষ’ই শেষ নয়। কূপের অন্ধকারেই আল্লাহ ভবিষ্যতের আশ্বাস দিলেন। ভাইয়েরা তাঁকে অন্ধকারে ফেলল, আর আল্লাহ অন্ধকারের ভেতরেই আলো পাঠালেন। বাহ্যিকভাবে তিনি একা; বাস্তবে তিনি আল্লাহর তত্ত্বাবধানে।

আজ যে যুবক জীবনের কোনো কূপে আটকে আছে—ব্যর্থতা, হতাশা, অপমান, একাকিত্ব, পরিবারগত সংকট, আর্থিক দুরবস্থা, শিক্ষাজীবনের স্থবিরতা—সে যেন মনে রাখে: কূপ গন্তব্য নয়; কূপ কখনো কখনো পথের একটি বাঁক। আল্লাহর পরিকল্পনায় কিছু ঘটনা গন্তব্য নয়; সেগুলো শুধু সেতু। মানুষ তোমাকে কূপে ফেলতে পারে, কিন্তু তোমার তাকদীরের দরজা বন্ধ করতে পারে না।

বাজারের দাম আর আসমানের মূল্য:

কূপ থেকে একটি কাফেলা ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে উদ্ধার করল। কুরআনে এসেছে, ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ﴾ ‘একটি কাফেলা এলো। তারা তাদের পানি সংগ্রহকারীকে পাঠাল। সে তার বালতি নামাল। সে বলে উঠল, কী আনন্দ! এ তো এক কিশোর!’ (ইউসুফ, ১২/১৯)।

কিন্তু তারা তাকে মুক্ত মানুষ হিসেবে সম্মান দিল না। পৃথিবীর বাজার তাকে বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। অতি নগণ্য মূল্যে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে বিক্রি করা হলো। কুরআনে এসেছে, ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ ‘তারা তাকে খুব সামান্য মূল্যে কয়েকটি গণনাযোগ্য দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল। তারা তার ব্যাপারে অনাগ্রহী ছিল’ (ইউসুফ, ১২/২০)।

অথচ সেই মুহূর্তেই, ঠিক সেই অবমূল্যায়নের ভেতর দিয়েই, আল্লাহ তাকে মিশরের ক্ষমতার কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে নিচ্ছিলেন। দুনিয়ায় আপনার মূল্য কত, এটা কোনো মানে রাখে না; আসমানের ঊর্ধ্বে যিনি, তাঁর কাছে আপনার মূল্য কত—সেটাই গুরুত্ব বহন করে। সাময়িক অবমূল্যায়ন স্থায়ী মূল্যহীনতা নয়। আজকে আপনি সাধারণ কেউ, তার অর্থ এই নয় যে, আগামীকালও আপনি সাধারণ কেউ থাকবেন।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম দাস হিসেবে বিক্রি হলেন। কিন্তু তারপর? আল্লাহ বলছেন, ‘মিশরের যে ব্যক্তি তাকে কিনেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল, তার থাকার ব্যবস্থা সম্মানজনক করো; হতে পারে সে আমাদের উপকার করবে অথবা আমরা তাকে সন্তানরূপে গ্রহণ করব’ (ইউসুফ, ১২/২১)।

মানুষ ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা বিজয়ী হয়। মানুষ দরজা বন্ধ করে, আল্লাহ দেয়ালের মধ্যেই দরজা সৃষ্টি করেন। যেখানে আপনার চেষ্টা ও শক্তি দুটোই ফুরিয়ে যায়, সেখান থেকে পথ শুরু করার সক্ষমতা আল্লাহ রাখেন। সকল চেষ্টার আগে আপনি যেমন তাঁর উপর ভরসা রাখতে পারেন, তেমনই সকল প্রচেষ্টা বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার পরও আপনি তাঁর উপর ভরসা রাখতে পারেন। পাহাড় ভেঙে যদি জীবনের সকল আলো চাপা পড়ে যায়, তখনও তার আলোর অপেক্ষা করা যায়। জীবন-নৌকা যদি কূলহীন উত্তাল সাগরে ভেসে যায়, তবু তাঁর কাছে মুক্তির আশা করা যায়। দুনিয়াতে কিছু যদি না-ও হয়, অবিচল ও সংশয়হীন সেই ভরসার জন্য পরকালে নেকী তো পাবেনই।

www.al-itisam.com

প্রাসাদের দরজা: নতুন পরীক্ষা

কূপ থেকে সুবিশাল প্রাসাদে। রাজকীয় জীবন। বিলাসিতা ও আরামময় নান্দনিক জিন্দেগি। অন্ধকার কূপ এবং পূর্বের পরিবার-বিচ্ছেদের বিপরীতে বর্তমান অবস্থা অনেকটা জান্নাতে থাকার মতো। তবে এই জৌলুসের জিন্দেগিই তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার দুয়ার উন্মুক্ত করেছিল। তিনি মানবজীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায় পড়েছিলেন। এমন এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছিলেন, যা মানুষের হৃদয়, ঈমান ও চরিত্রকে চূড়ান্তভাবে যাচাই করে। যার প্রাসাদে তিনি সুদর্শন তরুণ হয়ে উঠলেন, যার অজস্র অনুগ্রহে তার জীবন পরিপুষ্ট হলো, যিনি ক্ষমতা ও প্রভাবের অধিকারিণী—সেই গৃহকর্ত্রীই একদিন সব দরজা বন্ধ করে তাকে যেনার দিকে আহ্বান জানালেন।

একটু বিশ্লেষণ করি, এখানে কত জটিল এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। ইউসুফ আলাইহিস সালাম ছিলেন পূর্ণ যুবক; স্বাভাবিকভাবেই তার ভেতরে জৈবিক চাহিদা ছিল। যখন তাকে এই কুকর্মের দিকে আহ্বান করা হচ্ছিল, তখন চারদিকে কেউ ছিল না, কোনো সাক্ষী ছিল না, ধরা পড়ারও কোনো ভয় ছিল না। যিনি তাকে আহ্বান করছিলেন, তিনিই তো তাকে রাজকীয় জীবনের ব্যবস্থা করেছিলেন, দাসত্ব থেকে মুক্ত জীবন দিয়েছিলেন। এখন তাকে ‘না’ বলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা কতটা কঠিন হতে পারে? নিজেকে সেই স্থানে রেখে একবার কল্পনা করুন।

কিন্তু ইউসুফ আলাইহিস সালাম পেরেছিলেন। তাকে তো পারতেই হতো। যিনি একদিন মিশরের বাদশাহ হবেন, তিনি যদি সামান্য যৌন প্রলোভন থেকেই নিজেকে রক্ষা করতে না পারেন, তবে জনগণের সম্পদ আত্মসাতের লোভ কীভাবে সংবরণ করবেন? যত বড় যাত্রা, পথের নদীও তত বিশাল ও খরস্রোতা। ইতিহাসে তাঁর সেই জবাব অমর হয়ে রইল। কুরআনে এসেছে, ﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ﴾ ‘যে নারীর ঘরে সে ছিল, সে তাকে প্রলুব্ধ করল, দরজাগুলো বন্ধ করল এবং বলল, এসো। সে বলল, আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই’ *(ইউসুফ, ১২/২৩)*।

তিনি বললেন, ﴿مَعَاذَ اللَّهِ﴾ তথা ‘আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই’। তিনি শুধু পাপ থেকে পালাননি; তিনি আল্লাহর দিকে পালিয়েছেন। জীবনের কঠিনতম পরীক্ষাতেও রবের আশ্রয় নিতে ভুলেননি। আল্লাহ বলেন, ‘এভাবেই আমি তার থেকে মন্দ ও অশ্লীলতা সরিয়ে দিলাম। নিশ্চয়ই সে ছিল আমার নির্বাচিত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত’ *(ইউসুফ, ১২/২৪)*।

পাপ থেকে বাঁচতে কেবল নিজের শক্তি ও ঈমানী বলের উপর ভরসা করবেন না—রবের সাহায্য চান। আপনি ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর চেয়ে বেশি পরহেজগার নন; সুতরাং গুনাহ থেকে মুক্ত থাকতে রবের সাহায্য কামনা করা আপনার জন্য জরুরী। তিনি পাপ থেকে তো বেঁচে ফিরলেন, কিন্তু বিপদ থেকে মুক্তি পেলেন না।

অপবাদ: সত্যের ধীর পদধ্বনি

ইউসুফ আলাইহিস সালাম পাপ থেকে পালালেন, কিন্তু অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলেন না। ঘটনা এমনভাবে ঘুরে গেল যে, নির্দোষ ব্যক্তিই অভিযুক্ত হয়ে পড়লেন। অথচ দায়মুক্তির প্রমাণও উপস্থিত ছিল, ‘যদি তার (ইউসুফের) জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া হয়, তবে নারী সত্য বলেছে এবং সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়, তবে নারী মিথ্যা বলেছে এবং সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত’ *(ইউসুফ, ১২/২৬-২৭)*।

জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া ছিল। সত্যের সাক্ষ্য নিঃশব্দে উপস্থিত ছিল, তবু ক্ষমতার নিচে সেই সত্য চাপা পড়ে গেল। সত্য সবসময় সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ী হয় না। যেটাকে আপনি বিপদ থেকে মুক্তির সঠিক সময় ভাবছেন, রবের কাছে সেটা সঠিক সময় না-ও হতে পারে। নিজের চেষ্টার পাশাপাশি রবের নির্ধারিত সময়ের অপেক্ষা করুন।

মিশরের নারীদের সামনে তার সৌন্দর্য যেন মঞ্চায়িত হলো, প্রলোভনের ঘেরাটোপ আরও আঁটোসাঁটো হলো। নির্দোষ অবস্থায় অপরাধ স্বীকারের জন্য চাপ এলো, আর অবশেষে কারাগারে নিক্ষেপের ফয়সালা এলো। তিনি বলে উঠলেন, ‘হে আমার রব! তারা আমাকে যে পথে ডাকছে, তার চেয়ে কারাগারই আমার কাছে অধিক প্রিয়’ *(ইউসুফ, ১২/৩৩)*।

নিষ্পাপ অবস্থায়ই তিনি জেলে চলে গেলেন। বিপদ আসার কথা ছিল না, কিন্তু এলো। তবে বিপদ আপনার কাছে বিপদ, কিন্তু আপনার রবের কাছে এই বিপদের সংজ্ঞা কী? যেখানে আপনার মানবীয় ক্ষমতায় আপনি কেবল অন্ধকারই দেখেছেন, সেখানে রবের ফয়সালায় আপনার জন্য কী রাখা আছে, আপনি কি জানেন? রব তো সব কিছু দুনিয়াতেই দিয়ে দেন না। তিনি যদি আপনাকে সামান্য ৬০ বছরের জন্য সুখী না করে চিরদিনের জন্য সুখী করবেন বলে পরপারে আপনার প্রতিদান লিখে রাখেন—সেটা কি আমি বা আপনি জানি?

এখানে আরও একটি কথা, স্বাধীনতা সবসময় মুক্তি নয়, যদি সেই স্বাধীনতা মানুষকে পাপের দাস বানায়। আবার কারাগার সবসময় বন্দিত্ব নয়, যদি সেই কারাগার মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে।

(ইনশা-আল্লাহ! আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

প্রবন্ধ

বিভিন্ন ইসলামী দল ও জামা‘আতের সাথে যোগদান করার হুকুম

মূল: ড. বাকর ইবনে আব্দুল্লাহ আবূ যায়েদ
পরিমার্জন: সা‘দ ইবনে আব্দুর রহমান আল-হুছায়্যিন
অনুবাদ: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

(পর্ব-৪)

এই মর্যাদাপূর্ণ উপাধিগুলো অন্য যেকোনো ফেরকার উপাধির চেয়ে মৌলিক তিনটি কারণে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র:

প্রথমত: এগুলো এমন উপাধি বা পরিচয়, যা নবুঅতের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিম উম্মাহ থেকে কখনই এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্ছিন্ন হয়নি। বরং এগুলো প্রথম প্রজন্ম তথা ছাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতিতে এবং জ্ঞান অর্জন, তা অনুধাবনের মূলনীতি ও এর দিকে দাওয়াত দেওয়ার প্রকৃতির ক্ষেত্রে যাঁরা তাঁদের অনুসরণ করেন, তাদের পদ্ধতিতে সকল মুসলিমকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, এটি নির্দিষ্ট কোনো কাল বা স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এভাবে বুঝা আবশ্যক যে, এর তাৎপর্য জীবনের ধারাবাহিকতার মতোই চলমান এবং নাজাতপ্রাপ্ত দল আহলুল হাদীছ ওয়াস সুন্নাহর মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়াটা অবধারিত। আর তাঁরাই হলেন এই মানহাজের ধারক এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁরা টিকে থাকবেন। এটি নবী ﷺ-এর এই বাণী থেকে গৃহীত: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ ‘আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের ওপর বিজয়ী থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না; এমনকি আল্লাহর নির্দেশ এসে যাবে, কিন্তু তারা সেভাবেই থাকবে’।[৩]

দ্বিতীয়ত: এই উপাধিগুলো সমগ্র ইসলাম তথা পুরো কিতাব ও সুন্নাহকে ধারণ করে। সুতরাং তা এমন কোনো প্রতীকের সাথে নির্দিষ্ট নয়, যা কিতাব ও সুন্নাহর পরিপন্থি হতে পারে— তা সংযোজন করেই হোক কিংবা বিয়োজন করে।

তৃতীয়ত: এগুলো এমন উপাধি, যার কিছু ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আর এর মধ্যে কিছু উপাধি কেবল প্রবৃত্তিপূজারি ও পথভ্রষ্ট দলগুলোর মানহাজের মোকাবিলায় আত্মপ্রকাশ করেছে; তাদের বিদ‘আত খণ্ডন করতে, তাদের থেকে স্বতন্ত্র হতে, তাদের সাথে সংমিশ্রণ দূরে রাখতে এবং তাদের বর্জন করতে। সুতরাং যখন বিদ‘আতের প্রকাশ ঘটল, তখন তাঁরা ‘সুন্নাহ’-এর মাধ্যমে স্বাতন্ত্র্য লাভ করলেন। যখন ব্যক্তিগত মতামতের প্রাবল্য দেখা দিল, তখন তাঁরা ‘হাদীছ ও আছার’-এর মাধ্যমে স্বাতন্ত্র্য লাভ করলেন। আর যখন পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে বিদ‘আত ও প্রবৃত্তির বিস্তার ঘটল, তখন তাঁরা ‘সালাফদের হেদায়াত’-এর মাধ্যমে স্বাতন্ত্র্য লাভ করলেন। এভাবেই চলতে থাকল।

একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো: যদি মুসলিম উম্মাহ এই সমস্ত বিদ‘আত থেকে মুক্ত থেকে ইসলামের সঠিক রূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকত- যেমনটা প্রথম প্রজন্ম ও সালাফে ছালেহীনের প্রথম সারির ব্যক্তিবর্গ ছিলেন, তবে বিরোধী না থাকার কারণে আলাদা কোনো উপাধি ও নামের প্রয়োজন হতো না।

চতুর্থত: তাদের নিকট ‘আল-ওয়ালা ওয়াল বারা’ তথা কারো সাথে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা পোষণ করার মূল ভিত্তি হলো নিছক ইসলাম। এটি কোনো নতুন উদ্ভাবিত নাম ও প্রতীকের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং কেবল কিতাব ও সুন্নাহর ওপরই সীমাবদ্ধ।

পঞ্চমত: এই উপাধিগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া অন্য কোনো বিশেষ ব্যক্তির এবং তাঁর প্রদর্শিত সুন্নাহ ছাড়া অন্য কোনো আদর্শের প্রতি অন্ধ গোঁড়ামির দিকে মানুষকে আহ্বান করে না।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ-কে যখন উম্মাহর বিভক্তি বিষয়ক হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, ‘একারণেই তিনি নাজাতপ্রাপ্ত দলকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন... আর অন্যান্য ফেরকা বা দল হলো বিচ্যুতির পথ, বিভাজনের পথ এবং বিদ‘আত ও প্রবৃত্তিপূজার ধারক।

---

২. * বিএ (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এমএ এবং এমফিল, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৩. শায়খ মুহাম্মাদ আমান আল-জামী, ‘আছ-ছিফাতুল ইলাহিয়্যাহ’, পৃ. ৬৪-৬৫; হাদীছটি ইমাম বুখারী, মুসলিম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

এই ফেরকাগুলোর পরিচয় সম্পর্কে বহু বিজ্ঞ আলেম তাদের কিতাবসমূহে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তবে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো দলকে ৭২টি পথভ্রষ্ট ফেরকার অন্তর্ভুক্ত বলে নিশ্চিত করার জন্য অবশ্যই অকাট্য প্রমাণের প্রয়োজন। কেননা আল্লাহ তাআলা জ্ঞান ছাড়া কথা বলাকে সাধারণভাবে হারাম করেছেন এবং দ্বীনি বিষয়ে জ্ঞানহীন বক্তব্য দেওয়াকে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ‘বলুন, আমার পালনকর্তা কেবল অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন— যা প্রকাশ্য এবং যা গোপন। আর হারাম করেছেন পাপাচার, অন্যায় বিদ্রোহ এবং আল্লাহর সাথে এমন কিছুর শরীক করা, যার সপক্ষে তিনি কোনো দলীল নাযিল করেননি; আর আল্লাহর নামে এমন কিছু বলা, যা তোমরা জানো না’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/৩৩)*।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ‘যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পেছনে পড়ো না’ *(আল-ইসরা, ১৭/৩৬)*।

নিশ্চয়ই হক্ক ও সুন্নাহপন্থিদের একমাত্র আদর্শ ও অনুসরণীয় সত্তা হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ, যিনি মনগড়া কোনো কথা বলেন না; বরং তিনি যা বলেন, তা ওহী ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং তিনিই সেই সত্তা, যাঁর প্রতিটি সংবাদকে বিশ্বাস করা এবং প্রতিটি আদেশকে মান্য করা আবশ্যক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া অন্য কোনো ইমামের ক্ষেত্রে এই মর্যাদা প্রযোজ্য নয়; বরং তিনি ছাড়া অন্য যে কারো কথা গ্রহণ করা যেতে পারে অথবা বর্জন করা যেতে পারে।

এর দ্বারা এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নাজাতপ্রাপ্ত দল হওয়ার ব্যাপারে সবচাইতে বেশি হক্কদার হলেন ‘আহলুল হাদীছ ওয়াস সুন্নাহ’। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া তাদের অন্য কোনো অনুসরণীয় নেতা নেই, যাকে তারা অন্ধভাবে অনুসরণ করেন। তারাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণীসমূহ ও তাঁর অবস্থা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সবচাইতে বেশি অবগত এবং তাঁর হাদীছের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতার পার্থক্য নিরূপণে সবচাইতে বেশি পারদর্শী। তাদের ইমামগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণীসমূহ ও তাঁর অবস্থা সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী। তাঁরা সেগুলোর মর্মার্থ সম্পর্কে জ্ঞাত, তাঁরা বিশ্বাস ও আমলের ক্ষেত্রে সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী এবং যারা সুন্নাহকে ভালোবাসে, তাঁরা তাদেরও ভালোবাসেন আর যারা সুন্নাহর শত্রু, তাঁরা তাদেরও শত্রু।

ষষ্ঠত: এই উপাধিগুলো কোনো বিদ‘আত কিংবা পাপের দিকে ধাবিত করে না। এতে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি অন্ধ গোঁড়ামি বা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতিত্বও নেই। যখন ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত’ বলা হয়, তখন এর অধীনে ইসলামের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ অনুসারীগণ অন্তর্ভুক্ত হন। এই নামগুলো অন্য সেই সমস্ত ফেরকার মতো নয়, যারা বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে নিজেদের জন্য নতুন নতুন নাম ও প্রতীক তৈরি করেছে।

এখানে ‘সুন্নাহ’ বলতে বিদ‘আতের বিপরীত অর্থকে বোঝানো হয়েছে। যখন মানুষ বিদ‘আতের ফেতনায় আচ্ছন্ন হতে শুরু করল, তখন সুন্নাহর ওপর অটল থাকাই মুসলিম জামা‘আতের মূল পরিচয় হয়ে দাঁড়াল; ফলে তাদেরকে ‘আহলুস সুন্নাহ’ বলা হতে লাগল; যার বিপরীতে ছিল ‘আহলুল বিদ‘আহ’। আর তাদের ‘জামা‘আত’ বলা হয় একারণে যে, তারা মূল আদর্শের ওপর ঐক্যবদ্ধ এবং যারা প্রবৃত্তি ও বিদ‘আতের কারণে মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তারা তাদের বিরোধী। নবী ﷺ মুসলিমদেরকে ‘জামা‘আত’ নামকরণ করেছেন, কারণ তারা দ্বীনের অনুসরণ করার জন্য জামা‘আতবদ্ধ হয়েছেন; বিদ‘আত করার জন্য নয় এবং তারা ভ্রাতৃত্বের ওপর সংঘবদ্ধ হয়েছেন, কোনো বিভেদ করার জন্য নয়। একারণেই আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, إِنَّمَا الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ ‘জামা‘আত হলো তা-ই, যা হক্কের অনুকূলে থাকে— যদিও আপনি একা হন’।[৪]

একারণেই ইসলামের স্কলারগণ আক্বীদার কিতাবসমূহকে ‘কিতাবুস সুন্নাহ’ নামে নামকরণ করেছেন। কারণ আক্বীদা সরাসরি অনুসরণের সাথে এবং বিদ‘আতকে প্রত্যাখ্যান করার সাথে সম্পৃক্ত।

আর যখন বলা হয়- ‘আস-সালাফ’, ‘আস-সালাফিয়্যূন’ কিংবা ‘আস-সালাফিয়্যাহ’, তখন এর দ্বারা মূলত সালাফে ছালেহীন তথা ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের যথাযথ অনুসারীদের দিকে সম্বন্ধ উদ্দেশ্য হয়। ছাহাবায়ে কেরামের পরবর্তীদের মধ্যে যাদেরকে তাদের প্রবৃত্তি বিভ্রান্ত করেছে এবং যারা নতুন কোনো নাম বা নতুন কোনো প্রতীক নিয়ে সালাফে ছালেহীনের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাঁরা তাদের দিকে নিজেদের সম্বন্ধিত করেন না। একারণেই পরবর্তীদেরকে ‘আল-খালাফ’ বলা

৪. বায়হাক্বী, ‘আল-মাদখাল’; লালকাঈ, ‘শারহুস সুন্নাহ’।

www.al-itisam.com

হয় এবং তাদের দিকে কেউ নিজেকে সম্বন্ধিত করলে তাকে ‘খালাফী’ বলা হয়।

পক্ষান্তরে, যারা নবুঅতের মানহাজ তথা আদর্শের ওপর অবিচল থাকেন, তারা তাদের সালাফে ছালেহীনের দিকেই সম্পৃক্ত হন। ফলে তাদেরকে ‘আস-সালাফ’ ও ‘আস-সালাফিয়্যূন’ বলা হয়। আর তাদের দিকে পরিচয় প্রদানকারী ব্যক্তিকে ‘সালাফী’ বলা হয়।

এখানে ‘সালাফ’ শব্দটির অর্থ ‘প্রাচীন’ বা ‘পুরানো’ নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সালাফে ছালেহীনের আদর্শ। ঠিক একইভাবে ‘খালাফ’ (خَلَف) শব্দটি দিয়ে কেবল ‘দেরিতে আসা’ বোঝায় না; বরং এর একটি অর্থ হলো ‘অযোগ্য বা মন্দ উত্তরসূরি’। আর শব্দটির ل অক্ষরে সাকিন দিয়ে শব্দটি যদি ‘খাল্‌ফ’ (خَلْف) হয়, তবে তার একটিমাত্র অর্থ হয়, তা হলো ‘মন্দ উত্তরসূরি’; তখন শব্দটি কোনোভাবেই ভালো উত্তরসূরি বুঝায় না। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾ ‘অতঃপর তাদের পরে এক অপদার্থ উত্তরসূরি স্থলাভিষিক্ত হলো...’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/১৬৯)*।

অতএব, এখানে ‘সালাফ’ বলতে সালাফে ছালেহীন বা পুণ্যবান পূর্বসূরিদেরকেই বোঝানো হয়েছে। এর প্রমাণ হলো— এই শব্দটি যখন সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন এর দ্বারা সেই সকল ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়, যারা ছাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, এমনকি তারা আমাদের এই বর্তমান যুগের হলেও।

বিজ্ঞ আলেমগণ উক্ত বক্তব্যের উপর একমত। ফলে এটি (সালাফী) এমন কোনো গোষ্ঠীগত পরিচয় নয়, যা কিতাব ও সুন্নাহর গণ্ডির বাইরে; বরং এটি এমন এক পরিচয়, যা ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্ছিন্ন হয়নি। বরং তারা তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁদের দিকেই সম্বন্ধিত। কিন্তু যারা তাঁদের বিরোধিতা করে নতুন কোনো নামে বা প্রতীকে নিজেদের পরিচয় দেয়, তারা তাঁদের অন্তর্ভুক্ত নয়— যদিও তারা তাঁদের মাঝেই বসবাস করুক-না কেনো। আর ঠিক একারণেই ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম কদারিয়া ও মুরজিয়াদের মতো ভ্রান্ত দলগুলো থেকে নিজেদের সম্পর্কহীন ঘোষণা করেছিলেন।

‘যখন ইলমে কালাম বা দর্শনতাত্ত্বিক দলগুলোর মধ্যে দ্বীনের মৌলিক বিষয়াবলি নিয়ে বিবাদ শুরু হলো, তখন ‘সালাফী’ পরিভাষাটি ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করল। তখন প্রত্যেকেই নিজেদের সালাফদের অনুসারী বলে দাবি করতে চাইল এবং ঘোষণা দিল যে, তারা সে পথেই আছে, যে পথে সালাফগণ ছিলেন। এমতাবস্থায় সালাফী মানহাজের জন্য এমন কিছু সুদৃঢ় ও স্পষ্ট নীতি ও বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন দেখা দিল, যাতে সেসব লোকের নিকট সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ না ঘটে, যারা প্রকৃতপক্ষেই তাঁদের অনুসরণ করতে চায় এবং তাঁদের পথে চলতে চায়’।[৫]

‘সালাফদের মানহাজ’ এবং তা প্রমাণের পদ্ধতি নিয়ে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ-এর গভীর ও বিস্তারিত গবেষণা রয়েছে।[৬]

তেমনিভাবে যখন ‘আহলুল হাদীছ’ বা ‘আহলুল আছার’ বলা হয়, তখন এর দ্বারা এমন ব্যক্তিদের বোঝানো হয়, যারা বর্ণনা (রেওয়ায়াত) ও জ্ঞান (দেরায়াত) উভয় ক্ষেত্রেই হাদীছের প্রতি অধিক যত্নশীল এবং তারা ব্যক্তিগত মতামতের চেয়ে হাদীছকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। এমনকি চার ইমাম রহিমাহুমুল্লাহ ছিলেন আহলুল হাদীছদের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। কারণ তাঁদের প্রত্যেকেই বলেছেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِي ‘হাদীছ যখন ছহীহ প্রমাণিত হবে, তখন সেটিই আমার মাযহাব’।

বস্তুত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত হলো সেই ‘সরল পথ’ (ছিরাতে মুস্তাক্বীম), যা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অঙ্কন করেছিলেন। যেমনটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত বিখ্যাত হাদীছে এসেছে— রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সোজা রেখা টেনে বলেছিলেন, هَذَا سَبِيلُ اللهِ ‘এটিই আল্লাহর সরল পথ’। অতঃপর তিনি কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ ‘নিশ্চয় এটিই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করো এবং অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না, যা তোমাদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে’ *(আল-আন‘আম, ৬/১৫৩)*।

সুতরাং যিনিই এই সরল পথের অনুসরণ করেন, তিনিই ‘জামা‘আতুল মুসলিমীন’। মূলত তিনিই ইসলামের প্রকৃত স্বচ্ছতা ও আলোসহ এবং যে-কোনো ধরনের ভেজালমুক্তভাবে ইসলামকে ধারণ করেন। এর বাইরে যা কিছু আছে, তা হলো বিভ্রান্তি ও বিভাজনের রেখা, যা এই মূল পথের দুই ধারে ছড়িয়ে-

৫. মুহাম্মাদ আমান আল-জামী, আছ-ছিফাতুল ইলাহিয়্যাহ, পৃ. ৫৭-৫৮।
৬. আল-ফাতাওয়া, ৪/১৪৪-১৬৪।

ছিটিয়ে রয়েছে। এই বিচ্যুতির মাত্রা একেকজনের ক্ষেত্রে তাদের এই মূল পথ 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম' ও 'জামা'আতুল মুসলিমীন' থেকে নৈকট্য বা দূরত্বের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

এখানেই আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুঅতের একটি নিদর্শন স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে; যেখানে তিনি পূর্বেই সংবাদ দিয়েছিলেন যে, এই উম্মাহ ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে এবং কেবল একটি দলই হবে 'নাজাতপ্রাপ্ত' (اَلْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ)। তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেন, مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي 'যারা সেই আদর্শের ওপর থাকবে, যার ওপর আমি এবং আমার ছাহাবীগণ রয়েছি'। তারাই হলো সেই মুক্তিপ্রাপ্ত দল, যাদের সম্পর্কে তিনি বলেন, لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ 'আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই হক্বের উপর বিজয়ী থাকবে। তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে কেউ তাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। এমনকি এভাবে আল্লাহর আদেশ অর্থাৎ ক্বিয়ামত এসে পড়বে, কিন্তু তারা যেমনটি ছিল তেমনটাই থাকবে'।[৭]

অতএব, তারাই হলো ইসলামের প্রকৃত প্রতিরক্ষা ব্যূহ, যারা নবুঅতের মানহাজ তথা কিতাব ও সুন্নাহ-এর ওপর অবিচল, এ দু'টির দিকেই দাওয়াত দেন এবং এ দু'টির উপরেই তারা বন্ধুত্ব ও শত্রুতা (اَلْوَلَاءُ وَالْبَرَاءُ) পোষণ করে থাকেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নানা সংঘাতের মোকাবিলায় মুসলিম জামা'আত

'জামা'আতুল মুসলিমীন' হলো 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত' এবং তারা নবুঅতের মানহাজ তথা কুরআন ও সুন্নাহ-এর ওপর চলেন এবং এ দু'টির ভিত্তিতেই বন্ধুত্ব ও শত্রুতার সম্পর্ক (اَلْوَلَاءُ وَالْبَرَاءُ) স্থাপন করেন। জিহাদের ময়দানে এবং ইসলামকে রক্ষার মিশনে মূলত দু'টি ফ্রন্ট তাদের মোকাবিলায় কাজ করে, যে দু'টি মুসলিমদের দুর্বলতা ও বিভক্তির সমস্ত কারণকে ধারণ করে। আর সে দু'টি বিষয় হলো—

প্রথমত: বাহ্যিক বিপদ ও রক্তপিপাসু কাফের, যারা এখনো ইসলামের আলো সম্পর্কে জানেনি। তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করে, তা হচ্ছে বাহ্যিক বিপদ। তবে তারা সাধারণত তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না, কেবল ইসলামের দিকে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিভ্রান্ত দলের মাধ্যমে এবং তাদের মধ্য থেকে পরাজিত মানসিকতার দালালদের মাধ্যম ছাড়া। ফলে তারা এদের দিয়ে খুব কাছ থেকে ফেতনা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং মুসলিমদের সহযোগিতা না করে কাফেরদের সহযোগিতা করে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ 'মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যাহ' গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন যে, ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় এবং যুগ যুগ ধরে রাফেযী সম্প্রদায় তাদের চরমপন্থি ও বিচ্যুত দলগুলোর মাধ্যমে এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে।

দ্বিতীয়ত: উম্মাহর অভ্যন্তরীণ ভাঙন, যা এমন সব দল ও মতবাদের মাধ্যমে ঘটে, যেগুলো মুসলিম উম্মাহর যুবকদের হৃদয়ে ঘুরপাক খায়। এসব দল তাদের গহীনে নানাবিধ ত্রুটি ও ব্যাধি বহন করে এবং এগুলো দলের অনুসারীদেরকে 'জামা'আতুল মুসলিমীন' থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই দলগুলোর মাঝে থাকা বিদ'আত ও প্রবৃত্তির পূজা প্রতিরোধ করতে গিয়ে মুসলিমদের অনেক শক্তি খর্ব হয়েছে এবং রাত-দিনে তাদের প্রচুর সময় নষ্ট হয়েছে। কেননা দ্বীনের লেবাসে এই অভ্যন্তরীণ ভাঙন মূলত মুসলিমদের দুর্বলতা নির্দেশ করে, যা তাদের মূলধনে আঘাত হানে।

আর কুরআন ও সুন্নাহর আলোয় পথ চলা ব্যক্তিবর্গ তথা 'সাহায্যপ্রাপ্ত দল' (اَلطَّائِفَةُ الْمَنْصُوْرَةُ) মুসলিমদেরকে কুরআন-সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে তাদের এই ভাঙন জোড়া লাগানোর ক্ষেত্রে এক বিশাল ও মহান ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা ওই সমস্ত বিভেদ সৃষ্টিকারী দলসমূহের লালিত ভিত্তিগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে মুসলিমদের ভাঙন রোধ করেন, যে ভিত্তিগুলো শরী'আতের পাল্লায় বাতিল। যেমন: প্রবৃত্তির অনুসরণ, মুতাশাবিহ-এর ওপর ভিত্তি করে ফয়সালা করা, কাশফ (আধ্যাত্মিক উন্মোচন), ইলহাম (অনুপ্রেরণা), স্বপ্ন এবং অন্তরের ফতওয়াকে (আমার অন্তর আমার রবের কাছ থেকে আমাকে বর্ণনা করেছে!) দলীল বানানো। এছাড়াও খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীছের সমালোচনা করা, কুরআন-হাদীছের নছ বা মূল ভাষ্য যুক্তির বিরোধী বলে দাবি করা, প্রথা বা রীতিনীতিকে ফয়সালাকারী বানানো, বাতিলকে সুশোভিত করা, ইস্তিহসান তথা উত্তম বিবেচনা করা ও মাছালিহ মুরসালাহ তথা উন্মুক্ত জনস্বার্থ-এর দোহাই দিয়ে প্রবৃত্তির পক্ষে দলীল পেশ করা, কুরআন-সুন্নাহর উদ্ধৃতিকে খণ্ডিত করা এবং আহলুস সুন্নাহর বক্তব্যের মাঝে, বরং সুন্নাহর

৭. ছহীহ মুসলিম, হা/১৯২০।

www.al-itisam.com

মাঝে জালিয়াতি করার অপচেষ্টা করা। পাশাপাশি অপব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত ক্বিয়াস-এর মাধ্যমে কুরআন-সুন্নায় বিকৃতি সাধন করা এবং ব্যক্তিগত মতামত দ্বারা নাছ বা উদ্ধৃতির বিরোধিতা করা।

তদুপরি অন্ধ গোঁড়ামির কদর্যতা, পীর-মাশায়েখের প্রতি অন্ধ ভক্তি, শরী'আতের সীমালঙ্ঘন হয়- এমন বিষয়ে তাদের বিরোধিতাকে মারাত্মক বিপদ হিসেবে গণ্য করা, শরী'আতের উদ্দেশ্যসমূহকে (মাকাছিদ) উপেক্ষা করে কেবল শব্দের বাহ্যিক অর্থের ওপর ফয়সালা করা, বাতিলের আধিক্য দিয়ে দলীল পেশ করা, ইচ্ছেমতো মুতলাক্ব (اَلْمُطْلَقُ) দলীলকে মুকাইয়্যাদ(اَلْمُقَيَّدُ) করে দেওয়া এবং ইজমা-এর দাবি তুলে ভীতি প্রদর্শন করা।

আর বিদ'আতকে 'হাসানা' (উত্তম) ও 'সায়্যিআহ' (মন্দ)-তে বিভক্ত করার ভুল ধারণার সুযোগ নেওয়া, দলীল গ্রহণের পরিধি বাড়ানোর জন্য টেক্সটের অর্থের বিকৃতি ঘটানো, দুর্বল ও ভিত্তিহীন বর্ণনার ওপর নির্ভর করা, আরবী ভাষার নিয়মনীতি থেকে টেক্সটের বোঝাপড়াকে সরিয়ে নেওয়া, সুন্নাহর সাথে সুন্নাহর সাংঘর্ষিক হওয়ার দাবি তোলা, কুরআনের সাথে সুন্নাহর সাংঘর্ষিক হওয়ার দাবি করা এবং দাবি করা যে, প্রতিটি আয়াতের একটি প্রকাশ্য (যাহির) ও একটি গোপন (বাতিন) অর্থ রয়েছে— এগুলো সবই হলো বিদ'আতী ও প্রবৃত্তি পূজারিদের দলীল গ্রহণের ভিত্তি বা উৎস।

আর এই বিষয়গুলোর অধিকাংশের স্পষ্ট বর্ণনায় যাঁরা বিশাল অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন— ইমাম আশ-শাতিবী রহিমাহুল্লাহ; তিনি তাঁর 'আল-ইতিছাম' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। আর আমি 'উছূলুল ইসলাম লি-দারয়িল বিদা' আনিল আহকাম' গ্রন্থে উক্ত বিষয়গুলোকে মিথ্যা প্রমাণ করেছি। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾ 'আর যাতে করে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে যায়' *(আল-আন'আম, ৬/৫৫)*। অর্থাৎ উক্ত বিষয়গুলো বর্জন করার উদ্দেশ্যে।

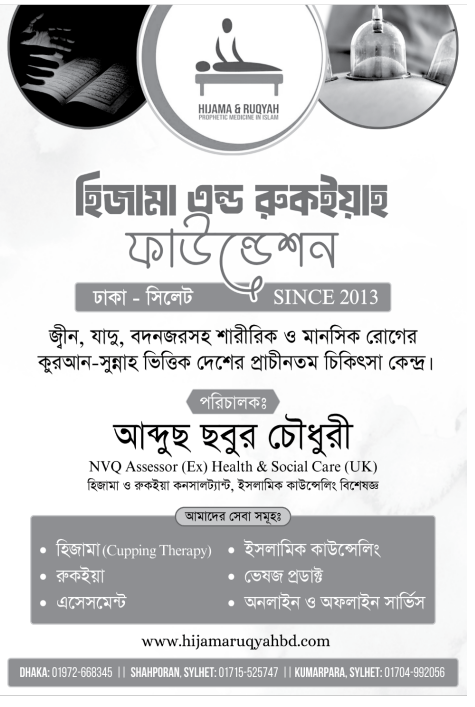
আর এখান থেকেই এই উম্মত বিভক্ত হয়ে যাওয়া সম্পর্কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে নবুঅতের নিদর্শনসমূহের একটি স্পষ্ট প্রমাণ ফুটে ওঠে যে, নাজাত বা মুক্তি কেবল একটি দলের জন্যই নির্ধারিত। আর সেটি হলো ওই দল, যাদের জন্য নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটিতে তাঁর লাঠি দিয়ে দাগ টেনে 'একটি সোজা পথ' অঙ্কন করেছিলেন এবং এর দুই পাশে আরও কিছু রেখা টেনেছিলেন; আর বলেছিলেন, সেই (আঁকাবাঁকা) রেখাগুলোর প্রতিটির মাথায় এক একটি শয়তান রয়েছে, যে সেদিকে আহ্বান করছে।

সুতরাং এই সোজা পথ বা সরল রেখাটিই হলো ইসলাম। আর ইসলাম মাত্র একটিই, এর কোনো বহুত্ব বা বিভাজন নেই। এর বাইরে যা কিছু আছে, তা অন্যান্য পথের অন্তর্ভুক্ত; তা ইসলামের একটি অংশ হলেও কখনই তা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে না। আর এর অনুসারী ব্যক্তি মূলত মুসলিমদের একটি দলের প্রতিনিধিত্ব করে— তার কাছে ইসলামের যতটুকু অংশ রয়েছে, ততটুকুর ভিত্তিতে- কম হলে কম আর বেশি হলে বেশি। অনুরূপভাবে তার কাছে ইসলামের যতটুকু অংশ রয়েছে, ততটুকুর অনুপাতে সে সরল পথ থেকে কাছে বা দূরে রয়েছে। কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের মূল জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন।

আর একারণেই যারা কোনো বিশেষ উপাধি গ্রহণ করেননি এবং ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ও এর প্রশস্ত গণ্ডি থেকে দূরে সরে যাওয়া কোনো জামা'আত বা দলের ফ্রেমে নিজেকে বন্দী করেননি, তাঁরাই হলেন মুসলিমদের জামা'আত। আর তাঁরাই হলেন ওই সমস্ত মানুষ, যাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিরক্ষায় শরী'আতের ফ্রন্টলাইনে সুদৃঢ় রয়েছেন এবং এই দু'টির ওপর ভিত্তি করেই বন্ধুত্ব ও শত্রুতার সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন।

পরিশেষে, মূল উত্তরের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে এই ৭টি পরিচ্ছেদ উল্লেখের পর এখন এই পুস্তিকার শুরুতে উল্লিখিত প্রশ্নটির উত্তরের বিস্তারিত বিবরণ আপনার সামনে পেশ করা হচ্ছে।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)



www.al-itisam.com

আল-কুরআনে নৃতত্ত্ব: একটি বিশ্লেষণ

-ড. এস এম আব্দুর রউফ*

ভূমিকা:

আল-কুরআন মানবজাতির উৎপত্তি, সভ্যতার উত্থান-পতন ও নিদর্শনের দলীল। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ ‘বলুন! পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো, অতঃপর দেখো মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কী হয়েছিল’ *(আল-আনআম, ৬/১১)*।

১. মানবসৃষ্টি ও দৈহিক নিদর্শন:

(ক) আঙুলের ছাপের স্বাতন্ত্র্য: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ - بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ ‘মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না? অবশ্যই, আমি তার আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম’ *(আল-কিয়ামাহ, ৭৫/৩-৪)*। তাফসীরে ইবনে কাছীরে বলা হয়েছে, ﴿بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ أَيْ: نَجْمَعُهَا بَعْدَ تَفَرُّقِهَا... حَتَّى بَنَانَهُ، وَهِيَ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ আল্লাহর বাণী ‘অবশ্যই আমি তার আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম’ অর্থাৎ হাড়গুলো বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর একত্রিত করব এবং নতুন করে সৃষ্টি করব, এমনকি আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত।[৯]

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, أَيْ نَجْعَلُ بَنَانَهُ مِثْلَ بَنَانِ غَيْرِهِ فَلَا يَشْتَبِهُ بَنَانُ أَحَدٍ بِبَنَانِ آخَرَ ‘আমি তার আঙুলের অগ্রভাগ অন্যের আঙুলের মতো বানাব (দর্শনের দিক থেকে), তবুও একজনের আঙুলের ছাপ অন্যজনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না’।[১০]

(খ) প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় সৃষ্টি: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ‘আর আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর’ *(আয-যারিয়াত, ৫১/৪৯)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ ‘পবিত্র তিনি, যিনি যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদকে, মানুষকে এবং যা তারা জানে না, তার প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন’ *(ইয়াসিন, ৩৬/৩৬)*। তাফসীরে ইবনে কাছীরে বলা হয়েছে, ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ أَيْ: جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ أَزْوَاجٌ: سَمَاءٌ وَأَرْضٌ، لَيْلٌ وَنَهَارٌ ‘সকল সৃষ্টি জোড়ায় জোড়ায়; আসমান-যমীন, রাত-দিন’।[১১]

৮. *সহকারী অধ্যাপক (আল-হাদীছ), শরীফ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, ধামরাই, ঢাকা।

৯. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৮/২৭১।

১০. তাফসীরে কুরতুবী, ১৯/১৪৭।

১১. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৭/৪৩৮।

২. মানুষের বংশগত ও জাতিগত বৈচিত্র্য:

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ ‘হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার’ *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১৩)*। তাফসীরে ইবনে কাছীরে বলা হয়েছে, ﴿لِتَعَارَفُوا﴾ أَيْ: لِيَعْرِفَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لَا لِيَتَفَاخَرُوا بِالْأَنْسَابِ অর্থাৎ ‘যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার, বংশ নিয়ে গর্ব করার জন্য নয়’।[১২]

৩. ভ্রূণতত্ত্ব ও মানব সৃষ্টির ধাপ:

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ - ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ - ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً﴾ ‘আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। অতঃপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/১২-১৪)*। তাফসীরে এসেছে, ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً﴾ أَيْ: مَاءً مَهِينًا يُصَبُّ فِي الرَّحِمِ، ثُمَّ تَحَوَّلَتِ النُّطْفَةُ إِلَى عَلَقَةٍ، وَهِيَ الدَّمُ الْجَامِدُ অর্থাৎ ‘অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করেছি, যা রেহেমে ঢালা হয়। তারপর শুক্রবিন্দু জমাট রক্তে পরিণত হয়।[১৩] আরও বলা হয়েছে, وَالْعَلَقَةُ: قِطْعَةُ دَمٍ جَامِدٍ تَتَعَلَّقُ بِجِدَارِ الرَّحِمِ অর্থাৎ ‘আলাকা হলো জমাট বাঁধা রক্তের টুকরা, যা রেহেমের দেওয়ালে ঝুলে থাকে’।[১৪]

৪. ভূতত্ত্ব: পর্বতের ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا - وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ ‘আমি কি পৃথিবীকে শয্যা করিনি? আর পর্বতকে পেরেক বানাইনি?’ *(আন-নাবা, ৭৮/৬-৭)*। তাফসীরে এসেছে, ﴿أَوْتَادًا﴾ أَيْ: لِتُثَبِّتَ الْأَرْضَ لِئَلَّا تَمِيدَ بِأَهْلِهَا অর্থাৎ ‘পেরেকের মতো, যাতে পৃথিবী তার অধিবাসীদের নিয়ে হেলে না যায়’।[১৫]

১২. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৭/৩৭৬।

১৩. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৫/৪৭৪।

১৪. তাফসীরে কুরতুবী, ১২/১।

১৫. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৮/৩০৮।

www.al-itisam.com

৫. জলচক্র ও বৃষ্টিবিদ্যা:

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ ‘আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে চালান, অতঃপর তাকে একত্রিত করেন, অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর আপনি দেখেন, তার মধ্য থেকে বৃষ্টি নির্গত হয়’ *(আন-নূর, ২৪/৪৩)*। তাফসীরে এসেছে, ﴿رُكَامًا﴾ أَيْ: مُتَرَاكِمًا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ، فَيَنْزِلُ مِنْهُ الْمَطَرُ অর্থাৎ ‘একটার উপর আরেকটা স্তরে স্তরে জমা করা হয়, তারপর তা থেকে বৃষ্টি নেমে আসে’।[১৬]

৬. ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন:

(ক) আদ জাতি: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا﴾ ‘তোমরা পাহাড় কেটে ঘর তৈরি করছ’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/৭৪)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ - الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ﴾ - ‘আপনি কি দেখেননি, আপনার রব আদ জাতির সাথে কী করেছিলেন? ইরাম গোত্রের, যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভের ন্যায় দীর্ঘ ছিল। যাদের মতো শক্তিশালী পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়নি’ *(আল-ফজর, ৮৯/৬-৮)*। তাফসীরে এসেছে, كَانُوا يَنْحِتُونَ الْجِبَالَ وَيَتَّخِذُونَهَا بُيُوتًا لِصَلَابَتِهَا وَقُوَّتِهَا অর্থাৎ ‘তারা পাহাড় কেটে ঘর বানাত তার দৃঢ়তা ও মজবুতির কারণে’।[১৭]

(খ) সামূদ জাতি: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ﴾ ‘তোমরা পাহাড় কেটে সুদক্ষতার সাথে গৃহ নির্মাণ করতে’ *(আশ-শুআরা, ২৬/১৪৯)*। তাফসীরে এসেছে, ﴿فَارِهِينَ﴾ أَيْ: مُتْقِنِينَ مَاهِرِينَ فِي نَحْتِهَا অর্থাৎ ‘ফারিহীন অর্থ দক্ষ ও পারদর্শীভাবে খোদাই করতে’।[১৮]

(গ) কওমে লূত: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ﴾ ‘অতঃপর যখন আমার আদেশ এলো, তখন আমি জনপদটিকে উল্টে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে পোড়া মাটির পাথর বর্ষণ করলাম’ *(হূদ, ১১/৮২-৮৩)*। তাফসীরে এসেছে, قَلَبْنَا الْمَدِينَةَ، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً অর্থাৎ ‘আমি শহরটিকে উল্টে দিলাম, উপরকে নিচে করে দিলাম এবং তাদের উপর পাথর বর্ষণ করলাম’।[১৯]

১৬. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৬/৫১।
১৭. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৩/৪৭৬।
১৮. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৬/১৮৯।
১৯. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৪/৩৫।

৭. নূহ আলাইহিস সালাম -এর কিসতি:

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾ ‘আর আমি একে নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি। অতএব, কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?’ *(আল-ক্বামার, ৫৪/১৫)*। তাফসীরে এসেছে, أَبْقَيْنَا سَفِينَةَ نُوحٍ عَلَى الْجُودِيِّ آيَةً لِمَنْ بَعْدَهُمْ অর্থাৎ ‘আমি নৌকার কাঠ জুদী পর্বতে নিদর্শন হিসেবে রেখে দিয়েছি পরবর্তীদের জন্য’।[২০]

৮. পাখির উড্ডয়ন:

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ﴾ ‘তারা কি উড়ন্ত পাখিকে দেখে না? এগুলো আকাশের অন্তরীক্ষে আল্লাহর আজ্ঞাধীন রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া কেউ এগুলোকে আগলে রাখে না’ *(আন-নাহল, ১৬/৭৯)*। তাফসীরে এসেছে, أَيْ: مَا يُمْسِكُهُنَّ فِي الْجَوِّ عِنْدَ قَبْضِهِنَّ أَجْنِحَتَهُنَّ إِلَّا اللهُ অর্থাৎ ‘ডানা গুটিয়ে নিলেও আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদের আকাশে ধরে রাখে না’।[২১]

উপসংহার:

কুরআনের নৃতাত্ত্বিক বর্ণনা আমাদের চারটি শিক্ষা দেয়, যথা—

১. তাওহীদ ও সাম্য: সকল মানুষ এক উৎস থেকে এসেছে।

২. ইতিহাসের শিক্ষা: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ ‘অতএব, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল’ *(আর-রূম, ৩০/৪২)*।

৩. আল্লাহর অমোঘ নিয়ম অপরিবর্তনীয়: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ ‘আর আপনি আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবেন না’ *(আল-ফাতহ, ৪৮/২৩)*।

৪. কুরআনের চ্যালেঞ্জ ও সংরক্ষণ: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ﴾ ‘আর যদি তোমরা তাতে সন্দেহ কর, যা আমি আমার বান্দার প্রতি নাযিল করেছি; তবে তার মতো একটি সূরা নিয়ে এসো’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৩)*।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ‘নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমিই এর সংরক্ষক’ *(আল-হিজর, ১৫/৯)*।

আল্লাহ আমাদের কুরআন সঠিকভাবে বুঝার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

২০. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৭/৪৯৫।
২১. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৪/৬০২।

www.al-itisam.com

আল্লাহ তাআলার ১০টি গুরুত্বপূর্ণ নছীহত

মূল: হাফেয জালালুদ্দীন কাসেমী*
পরিমার্জিত অনুবাদ: তাওহীদুর রহমান সালাফী**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ নছীহত: ইয়াতীমের ধনসম্পদ ভক্ষণ করা নিষেধ

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ ‘আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না, সুন্দর পন্থা ছাড়া। যতক্ষণ না সে পরিণত বয়সে উপনীত হয়’ *(আল-আনআম, ৬/১৫২)*। এই আয়াতে حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ বলতে পরিণত বয়সে উপনীত হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে।

সমাজের এক দুর্বল শ্রেণির লোক হচ্ছে ইয়াতীম তথা অনাথ শ্রেণির লোক। তাদের সাথে সদাচরণ করার অনেক ফযীলত শরীআতে এসেছে।

নবী ﷺ-এর একটি হাদীছে অনুরূপ এসেছে, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ‘আত্মীয় বা অনাত্মীয় ইয়াতীমের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও আমি জান্নাতে এ দুই আঙুলের ন্যায় কাছাকাছি থাকব’।[২৩] وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى বর্ণনাকারী মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু হাদীছ বর্ণনার সময় শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করে দেখালেন।

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি ﷺ বলেছেন, اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ ‘সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে’। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সেগুলো কী? তিনি বললেন, ‘(১) আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, (২) জাদু, (৩) আল্লাহ তাআলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরীআত-সম্মত কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা, (৪) সূদ খাওয়া, (৫) ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা, (৬) রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরলস্বভাবা সতীসাধ্বী মুমিন নারীদের অপবাদ দেওয়া’।[২৪]

সপ্তম গুরুত্বপূর্ণ নছীহত: ওযন-মাপে পূর্ণমাত্রায় দেওয়ার আদেশ

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ‘আর পরিমাপ ও ওযন ইনছাফের সাথে পরিপূর্ণ দেবে। আমি কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করি না’ *(আল-আনআম, ৬/১৫২)*।

এই ব্যাপারে নবী ﷺ-এর একটি হাদীছ এসেছে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী ﷺ ব্যবসায়ীদের বলেন, إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرًا فِيهِ هَلَكَةُ الْأُمَّةِ السَّالِفَةِ ‘তোমাদেরকে এমন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে পূর্বের উম্মত ধ্বংস হয়ে গেছে’।[২৫]

অষ্টম গুরুত্বপূর্ণ নছীহত: হক্ব এবং সত্য বলার আদেশ

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ ‘আর যখন তোমরা কথা বলবে; তখন ন্যায্য বলবে, স্বজনের সম্পর্কে হলেও’ *(আল-আনআম, ৬/১৫২)*।

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ﴾-তে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ন্যায়-ইনছাফের আদেশ রয়েছে এবং ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾-তে কথাবার্তার ক্ষেত্রে ন্যায়-ইনছাফের আদেশ রয়েছে। ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ বলে এটা বুঝানো হয়েছে যে, ইনছাফের ক্ষেত্রে বংশীয় সম্পর্কের কোনো বিশেষ অবস্থান নেই। এই ব্যাপারে একটি হাদীছ এসেছে। أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

---

২২. *বিশিষ্ট দাঈ, ভারত।

**ফারেগ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বানারাস, উত্তরপ্রদেশ, ভারত; শিক্ষক, সরল পথ একাডেমি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

২৩. ছহীহ মুসলিম, ‘মর্মস্পর্শী বিষয়সমূহ ও দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণহীনতা’ অধ্যায়, হা/২৯৮৩।

২৪. ছহীহ বুখারী, হা/২৭৬৬।

২৫. মুসতাদরাক হাকেম, ‘ব্যবসা’ অধ্যায়, ২/৩০, হা/২২৩২, সূত্র দুর্বল। এই বর্ণনায় হুসাইন ইবনে কায়স নামে মাতরূক রাবী রয়েছে।

www.al-itisam.com

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, মাখযূম গোত্রের এক চোর নারীর ঘটনা কুরাইশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুলল। এ অবস্থায় তারা বলাবলি করতে লাগলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কে আলাপ করতে পারে? তারা বললেন, একমাত্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয়তম উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু এ ব্যাপারে আলোচনা করার সাহস করতে পারেন। উসামা রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কথা বললেন। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘনকারিণীর সাজা মওকূফের সুপারিশ করছ?' অতঃপর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুৎবায় বললেন, 'তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহকে এ কাজই ধ্বংস করেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো বিশিষ্ট লোক চুরি করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অন্যদিকে যখন কোনো অসহায় গরীব সাধারণ লোক চুরি করত, তখন তার উপর হদ্দ জারি করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদ এর কন্যা ফাতেমা চুরি করত, তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম'।[২৬]

সাথে এটাও মনে রাখা দরকার যে, ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ﴾ এর সম্পর্ক দ্বীনের দাওয়াতের সাথেও রয়েছে। যেখানে ন্যায়-ইনছাফের অর্থ হচ্ছে যে, এদিক সেদিক করে দলীলের ভাবার্থ যেন পরিবর্তন না হয় এবং বাড়াবাড়ি ও অনর্থক জিনিস থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

নবম গুরুত্বপূর্ণ নছীহত: অঙ্গীকার পূরণ করার আদেশ

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾ 'আর আল্লাহকে দেওয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করবে' *(আল-আনআম, ৬/১৫২)*।

এখানে ﴿أَوْفُوا﴾-কে পরে নিয়ে এসে এটা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন সবার আগে।

'ওয়াদা' وعد এক পক্ষ থেকে হয় এবং 'আহদ' عهد দুই পক্ষ থেকে হয় আর 'আক্বদ' عقد যেটা লিখিত আকারে হয়। এ ব্যাপারে একটি হাদীছ এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

'চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকে, সে মুনাফেক্ব অথবা যার মধ্যে এ চারটি স্বভাবের কোনো একটা থাকে, তার মধ্যেও মুনাফেক্বীর একটি স্বভাব থাকে, যে পর্যন্ত না সে তা পরিত্যাগ করে— (১) সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, (২) যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে, (৩) যখন চুক্তি করে তা লঙ্ঘন করে এবং (৪) যখন ঝগড়া করে অশ্লীল বাক্যালাপ করে'।[২৭]

২৬. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৭৫।

২৭. ছহীহ বুখারী, 'অত্যাচার ও লুণ্ঠন' অধ্যায়, হা/২৪৫৯।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

১৫১ নম্বর আয়াতের শেষে ﴿تَعْقِلُونَ﴾ রয়েছে। ইমাম রাযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই আয়াতে পাঁচটি এমন আদেশ-নিষেধ রয়েছে, যেগুলো জানা ও বুঝা জরুরী।

আর ১৫২ নম্বর আয়াতে ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ এর পরিবর্তে ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ নিয়ে এসে এটা বুঝানো হয়েছে যে, শুধু স্মরণ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং অন্তরে সেই উপদেশগুলোকে বারবার জায়গা দেওয়া এবং তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করাই মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সাথে সাথে এটাও জানা গেল যে, যখন অন্তরের মাধ্যমে স্মরণ করা হবে; তখন মুখ দিয়েও স্মরণ করা হয়ে যায়।

১৫১ নম্বর আয়াতের পাঁচটি নছীহতে ﴿تَعْقِلُونَ﴾ নিয়ে এসে এটা বুঝানো হয়েছে যে, সেগুলো একদম স্পষ্ট এবং এখানে ﴿تَذَكَّرُونَ﴾নিয়ে এসে এটা বুঝানো হয়েছে যে, এই চারটি নছীহতে চিন্তাভাবনা আর পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে, যাতে করে সমতা বজায় থাকে।

দশম গুরুত্বপূর্ণ নছীহত: সরল পথের অনুসরণ

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ 'আর এ পথই আমার সরল পথ। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ করো এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা তাক্বওয়ার অধিকারী হও' *(আল-আনআম, ৬/১৫৩)*।

এই হাদীছে এটা উপদেশ রয়েছে যে, শুধু সরল পথেরই অনুসরণ করতে হবে। ছিরাতে মুস্তাক্বীম এর ব্যাখ্যা এক হাদীছে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই করেছেন। হাদীছটি হলো এরকম, জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন,

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَخَطَّ خَطًّا وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الأَوْسَطِ فَقَالَ « هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

আমরা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি একটি সরলরেখা টানলেন এবং তার ডান দিকে দুটি সরলরেখা টানলেন এবং বাম দিকেও দুটি সরলরেখা টানলেন। অতঃপর তিনি মধ্যবর্তী রেখার উপর তাঁর হাত রেখে বলেন, 'এটা আল্লাহর রাস্তা। অতঃপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন, আর এ পথই আমার সরল পথ। অতএব, তোমরা এ পথেরই অনুসরণ করো এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না; অন্যথা তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে'।[২৮]

২৮. ইবনু মাজাহ, 'সুন্নাহ' অধ্যায়, হা/১১, ইমাম আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ

www.al-itisam.com

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজের পথকে ‘ছিরাত’ বলেছেন। কেননা সেটা সহজ।

অন্যান্য পথ ছেড়ে দিয়ে শুধু নবী ﷺ-এর পথকে গ্রহণ করাই হচ্ছে ছিরাতে মুস্তাক্বীম বা সরল পথ। মতানৈক্য ও মতপার্থক্য থেকে বাঁচার এটাই একমাত্র রাস্তা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

‘আর কারো নিকট সৎ পথ প্রকাশিত হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে আমরা ফিরিয়ে দেব এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করাব আর তা কতই না মন্দ আবাস!’ *(আন-নিসা, ৪/১১৫)*।

কুরআন মাজীদের প্রথম সূরাতেই ‘ছিরাতে মুস্তাক্বীম’-এর ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ ‘আমাদেরকে সরল পথের হেদায়াত দিন। তাদের পথ, যাদেরকে আপনি নেয়ামত দিয়েছেন’ *(আল-ফাতিহা, ১/৫-৬)*। তাই সেই পথ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যের পথ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا - وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾

‘আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করতাম। আর কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবী, ছিদ্দীক্ব (সত্যনিষ্ঠ), শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কতই না উত্তম সঙ্গী!’ *(আন-নিসা, ৪/৬৮-৬৯)*।

আল্লাহ তাআলার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক এবং নবী ﷺ-এর আনুগত্য ও অনুসরণই হচ্ছে ছিরাতে মুস্তাক্বীম বা সরল পথ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ‘আর কেউ আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করলে সে অবশ্যই সরল পথের হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে’ *(আলে ইমরান, ৩/১০১)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ‘নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই আমার রব এবং তোমাদেরও রব। অতএব, তোমরা তাঁর ইবাদাত করো, এটাই সরল পথ’ *(আয-যুখরুফ, ৪৩/৬৪)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ ‘আর আপনি তো অবশ্যই সরল পথের দিকে দিকনির্দেশ করেন। সেই আল্লাহর পথ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তার মালিক। জেনে রাখুন! সব বিষয় আল্লাহরই দিকে ফিরে যাবে’ *(আশ-শূরা, ৪২/৫২-৫৩)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ‘আর তোমরা আমারই অনুসরণ করো। এটাই সরল পথ’ *(আয-যুখরুফ, ৪৩/৬১)*।

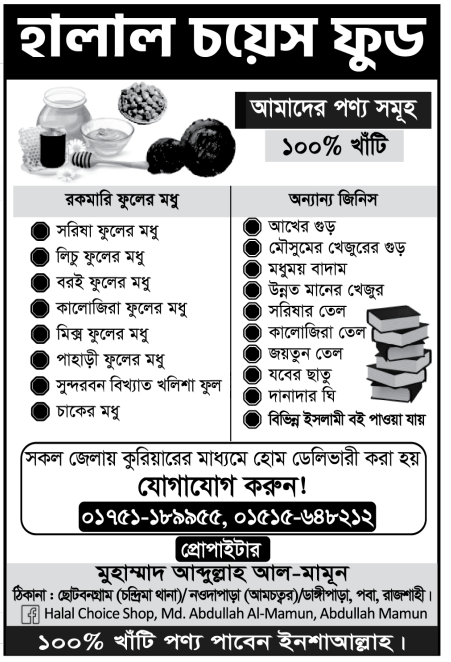
যদি কোনো বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়, তাহলে তার সমাধানও এটা যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর দিকে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

‘হে ঈমাদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো, আরও আনুগত্য করো তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের। অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত করো আল্লাহ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাক। এ পন্থাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর’ *(আন-নিসা, ৪/৫৯)*।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে এসব বাস্তবায়নের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

বলেছেন, যদিও কিছু মুহাক্কিক সেই হাদীছের সূত্রকে দুর্বল বলেছেন।



www.al-itisam.com

ঈদে মীলাদুন নবী: শারঈ মূল্যায়ন

-মো. আকরাম হোসেন*

ভূমিকা:

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যার ভিত্তি কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ। মুসলিমদের সকল ইবাদত, উৎসব ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা এই দুই উৎসের আলোকে নির্ধারিত হয়। বর্তমানে রবীউল আউয়াল মাসে 'ঈদে মীলাদুন নবী' নামে একটি দিবস বিভিন্ন দেশে পালন করা হয়। এটি নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্মদিন হিসেবে উদযাপিত হলেও প্রশ্ন হলো, ইসলামী শরীআতে এর কোনো ভিত্তি আছে কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর ছাহাবীগণ কিংবা সালাফে ছালেহীন কি কখনো এ দিবস পালন করেছেন? এই প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে তা জানার চেষ্টা করব ইনশা-আল্লাহ।

ঈদে মীলাদুন নবীর পরিচয়:

'ঈদে মীলাদুন নবী' তিনটি আরবী শব্দের সমন্বয়ে গঠিত—'ঈদ', 'মীলাদ' ও 'নবী'।

'ঈদ' অর্থ বারবার ফিরে আসা আনন্দময় সমাবেশ বা উৎসব। আর 'মীলাদ' অর্থ জন্ম। সুতরাং 'ঈদে মীলাদুন নবী' বলতে নবী ﷺ-এর জন্ম উপলক্ষ্যে আনন্দ বা উৎসব উদযাপনকে বোঝায়।

বর্তমানে ১২ রবীউল আউয়ালকে কেন্দ্র করে ওয়ায, যিকির, ক্বিয়াম, মিছিল, মাহফিল ও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে যে অনুষ্ঠান পালন করা হয়, সেটিই সাধারণত 'ঈদে মীলাদুন নবী' নামে পরিচিত।

ঈদে মীলাদুন নবীর উৎপত্তি:

কুরআন ও ছহীহ হাদীছে ঈদে মীলাদুন নবী পালনের কোনো নির্দেশনা নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনের যুগেও এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

ইতিহাসবিদদের মতে, হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে মিসরের ফাতেমীয় শাসকগোষ্ঠী সর্বপ্রথম বিভিন্ন ব্যক্তির জন্মোৎসব উদযাপন শুরু করে। পরবর্তীতে এটি আরও বিস্তার লাভ করে। অন্য একটি মত অনুযায়ী, হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে ইরাকের এরবেল অঞ্চলের শাসক মুযাফফারুদ্দীন কুকবুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় নবী ﷺ-এর জন্মোৎসব ব্যাপকভাবে উদযাপিত হয়।

অতএব ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী, এই অনুষ্ঠান নবী ﷺ-এর ইন্তেকালের বহু শতাব্দী পরে চালু হয়েছে।

শারঈ হুকুম:

ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে ঈদে মীলাদুন নবী একটি নব উদ্ভাবিত বিষয় (বিদআত)। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এটি পালন করেননি, পালন করতে নির্দেশও দেননি। খুলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন কিংবা চার মাযহাবের ইমামদের কেউও এটি পালন করেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু নতুন বিষয় প্রবর্তন করবে, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৩০] অন্য হাদীছে তিনি বলেছেন, فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ 'প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত বিষয় বিদআত, আর প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী'।[৩১]

এ কারণে বহু আলেম, যেমন শায়খ ইবনু বায,[৩২] শায়খ ইবনু উছায়মীন[৩৩] ও শায়খ ছালেহ আল-ফাওযান[৩৪] রাহিমাহুমুল্লাহ ঈদে মীলাদুন নবী উদযাপনকে বিদআত বলে অভিহিত করেছেন।

প্রচলিত কার্যক্রম ও তার মূল্যায়ন:

বর্তমানে ঈদে মীলাদুন নবী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে মিছিল ও শোভাযাত্রা, মীলাদ মাহফিল, বিশেষ খাবার বিতরণ, আলোকসজ্জা, গান-বাজনা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এসব অনুষ্ঠানে শরীআতবিরোধী কর্মকাণ্ড, অপচয়, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং অতিরঞ্জিত বিশ্বাসের চর্চা দেখা যায়। কোথাও কোথাও এমন ধারণাও প্রচলিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রূহ এসব মাহফিলে উপস্থিত হন। অথচ এ ধরনের বিশ্বাসের কোনো শারঈ ভিত্তি নেই।

বাকি অংশ ২৩ নং পেজে...

২৯* প্রভাষক (আরবী), পাঁচটিকরী আলিম মাদরাসা, ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

৩০. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮।
৩১. আবূ দাঊদ, হা/৪৬০৭; তিরমিযী, হা/২৬৭৬।
৩২. মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে বায, ১/১৭৮।
৩৩. মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে উছায়মীন, ২১/৬২।
৩৪. আল-ইজলাল আল-ইলমী ওয়াল আমালী, পৃ. ১৫২।

www.al-itisam.com

জন্মদিন পালনের উৎপত্তি ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

-আহমাদ বিন আব্দুস সালাম*

পৌত্তলিকতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মূর্তিপূজা করা ও মূর্তির সাথে সম্পৃক্ত থাকা। ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসা প্রথা জন্মদিন উপলক্ষ্যে কেক কাটা এবং মোমবাতি প্রজ্বলন করা প্রাচীন পৌত্তলিক মূর্তিপূজার সাথে সম্পর্কিত। প্রাচীনকালে বিশ্বাস করা হতো যে, মোমবাতির আগুনের জাদুকরী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তারা প্রার্থনা করত এবং মোমবাতির শিখাকে দেবতাদের কাছে নিয়ে শুভেচ্ছা জানাতো। এভাবে আমাদের সমাজে এখনোও জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো এবং তারপর মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়ার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। গ্রীকরা তাদের চাঁদের দেবী 'আর্টেমিসের' জন্মদিন উদযাপন করত কেক দিয়ে এবং আলোকিত মোমবাতি দিয়ে।

'মিশরীয়রা আবিষ্কার করেছিল কোন দেবতার কাছে কোন মাস ও দিন পবিত্র এবং তার জীবনের পথে সে কীসের সাথে মিলিত হবে, তার দিনগুলো কীভাবে শেষ হবে এবং সে কেমন মানুষ হবে তা একজন মানুষের জন্মের দিন থেকে খুঁজে পাওয়া যায়'।[৩৬]

যেহেতু এটি বিশ্বাস করা হয়েছিল যে, জন্মের সময় তারার অবস্থান একটি শিশুর ভবিষ্যতের সাথে যুক্ত, তাই জন্মের সময়ের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রীয় রাশিফল তৈরি হয়েছিল। 'জন্মদিনগুলো নক্ষত্রের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত, যেহেতু ক্যালেন্ডার ছাড়া কেউ বলতে পারে না কখন তার জন্মদিন উদযাপন করবে। তারা অন্যভাবে নক্ষত্রের কাছেও ঋণী, কারণ নক্ষত্রের উপর নির্ভর করেই জন্মদিন নির্ধারণ করা হতো'।[৩৭]

তাছাড়া, The lore of Birthday বইটির ৮, ১৮-২০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, গ্রীকরা বিশ্বাস করত যে প্রত্যেকেরই একটি প্রতিরক্ষামূলক আত্মা ছিল, যে তার জন্মে উপস্থিত হয়েছিল এবং তার জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছিল। যেই দিনে ব্যক্তিটি জন্মগ্রহণ করেছিল, ওই আত্মার সাথে দেবতার একটি রহস্যময় সম্পর্ক ছিল।

রোমানরাও এই বিশ্বাস লালন করেছিল। এই ধারণা মানুষের বিশ্বাসের মধ্যে প্রবহমান ছিল এবং কেকের উপর মোমবাতি জ্বালানোর রীতির সূচনা গ্রীকদের দ্বারাই হয়েছিল। আর্টেমিসের মন্দিরের বেদিতে চাঁদের মতো গোলাকার মধুর কেক আলোকসজ্জা দিয়ে আলোকিত করা হতো। শুভেচ্ছা জানানোর জন্য জন্মদিনের মোমবাতিগুলো বিশেষ জাদু দ্বারা তৈরি করা হতো।

প্রাচীন গ্রীকরা বিশ্বাস করত যে, প্রতিটি ব্যক্তির একটি আত্মা আছে, যা তার জন্মে উপস্থিত হয় এবং নজর রাখে। সেই আত্মার সাথে ঈশ্বরের একটি রহস্যময় সম্পর্ক রয়েছে, যা তার জন্মের দিন থেকে বিদ্যমান।

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, পৌরাণিক কাহিনী, জাদু ও রাশিফলের জন্মদিনের উৎপত্তিতে সম্ভবত একটি ভূমিকা রয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্র জন্মদিনের সত্যিই বড় প্রবক্তা। প্রাচীন রোমানরা উৎসাহের সাথে হেডোনিস্টিক পার্টি এবং উপহারের সাথে জন্মদিন উদযাপন করত।[৩৮]

আমরা উক্ত পর্যালোচনা থেকে দেখতে পেলাম যে, জন্মদিনকে কেন্দ্র করে কেক কাটা, অনুষ্ঠান করা বা উপহার বিনিময় করার সাথে মুসলিমদের কোনো সম্পর্ক নেই।

সুতরাং পৌত্তলিকদের আবিষ্কৃত এই প্রথা মুসলিমরা উদযাপন করতে পারে না। আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা থেকে তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلاَ بِالنَّصَارَى 'সে আমার উম্মত নয়, যে অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য বজায় রাখে। তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য বজায় রেখো না'।[৩৯] আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত'।[৪০]

আলোচ্য আলোচনা প্রমাণ করে যে, জন্মদিবস উদযাপন করা, কেক কাটা ইত্যাদি প্রথার সূত্রপাত ঘটে পৌত্তলিকদের থেকে। জন্মদিবসকে কেন্দ্র করে যে আচার-আনুষ্ঠানিকতা বিদ্যমান তা ইসলামী আদর্শের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। তাই শুধু জন্মদিন কিংবা অন্য কোনো অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কেক কাটা, মোমবাতি জ্বালানো বা আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

---

৩৫. * চকবাজার, ঢাকা।

৩৬. Herodotus, Persian Wars, Book ||, Ch 82.

৩৭. Ralph and Adelin Linton, The lore of Birthday, p. 53.

৩৮. Argetsinger K. 'Birthday Rituals: Friends and Patrons in Roman Poetry and Cult.' Classical Antiquity 11 (2), 1992: pp. 175–193.

৩৯. তিরমিযী, হা/২৬৯৫, হাসান।

৪০. আবূ দাউদ, হা/৪০৩১, হাসান।

www.al-itisam.com

সমকামিতা: মানববিধ্বংসী পদক্ষেপ

-মেরাজুল ইসলাম প্রিয়*

হঠাৎ হিরো বনে যাওয়া এমন কিছু লোক আজ এলজিবিটি (LGBT)-কে সমতন্ত্র, বন্ধু ওয়েলফেয়ার, ট্রান্সজেন্ডার, ইনক্লুসিভ ইত্যাদি বিভিন্ন মোড়কে বাজারজাতকরণে জোর প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এরাই মূলত মানবতার মোড়কে মানববিধ্বংসী ব্যক্তিত্ব। এরা মানববিধ্বংসী, কারণ এরা মানুষ সৃষ্টির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে। অথচ মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ ‘হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও’ *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১৩)*।

এরা মানববিধ্বংসী, কারণ এরা নারী-পুরুষের স্বাভাবিক জৈবিক কাঠামোতে পরিবর্তনকারী, যা একটা সমাজকে ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ‘নারীর সাদৃশ্য ধারণকারী পুরুষ ও পুরুষের সাদৃশ্য ধারণকারিণী নারীর উপর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা‘নত করেছেন’।[৪২] ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর বর্ণনায় আরও এসেছে, তিনি বলেন, ‘নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষ ও পুরুষের বেশ ধারণকারিণী নারীর উপর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন আর বলেছেন, “তোমাদের ঘর থেকে তাদেরকে বের করে দাও”। অতঃপর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক লোককে বের করে দিয়েছিলেন এবং উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু ও এক ব্যক্তিকে বের করে দিয়েছিলেন’।[৪৩]

এরা মানববিধ্বংসী, কারণ এরা পৃথিবীর বুকে নারী-পুরুষকে ট্রান্সজেন্ডার, লৈঙ্গিক বৈচিত্র্য, নারী অধিকার, আমার পোশাক আমার অধিকার ইত্যাদি নানাবিধ চটকদার স্লোগানে অতীব ঘৃণ্য আচরণ ও জঘন্যতম অশ্লীলতার প্রসার ঘটাতে চায়। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ‘নিশ্চয়ই যারা মুমিনদের ভিতরে অশ্লীলতার প্রসার ঘটাতে চায়, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না’ *(আন-নূর, ২৪/১৯)*।

এরা মানববিধ্বংসী, কারণ এদের শিকড় গেঁথে রয়েছে ক্বওমে লূতের সাথে, যাদেরকে মহান আল্লাহ সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আর আমি লূতকেও পাঠিয়েছিলাম। তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, “তোমরা কি এমন খারাপ কাজ করে যাচ্ছ, যা তোমাদের আগে সৃষ্টিকুলের কেউ করেনি? তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারীদের ছেড়ে পুরুষের কাছে যাও, বরং তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়”। উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বহিষ্কার কর, এরা তো এমন লোক, যারা অতি পবিত্র হতে চায়। অতঃপর আমরা তাকে ও তার পরিজনদের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম, তার স্ত্রী ছাড়া, সে ছিল পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আর আমরা তাদের উপর ভীষণভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। কাজেই দেখুন, অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/৮০-৮৪)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ - مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ ‘অতঃপর যখন আমাদের ফয়সালা আসল, তখন আমরা সেটার উপরিভাগকে নিম্নভাগে পরিণত করে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম পোড়ামাটির পাথর, যা আপনার রবের কাছে চিহ্নিত ছিল। আর এটা যালেমদের থেকে দূরে নয়’ *(হূদ, ১১/৮২-৮৩)*। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর একটি বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ثَلَاثًا ‘আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক তার উপর, যে ক্বওমে লূতের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক তার উপর, যে ক্বওমে লূতের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়’। একথা তিনি তিনবার বললেন।[৪৪] ইবনুল হাজ্জ আল-মালেকী রহিমাহুল্লাহ সমকামিতার আলোচনা করতে গিয়ে এর তিনটি পর্যায় উল্লেখ করেছেন।[৪৫]

১ম পর্যায়:

طَائِفَةٌ تَتَمَتَّعُ بِالنَّظَرِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ النَّظْرَةَ إِلَى الْأَمْرَدِ بِشَهْوَةٍ حَرَامٌ إِجْمَاعًا. بَلْ صَحَّحَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ.

অর্থাৎ এই পর্যায়ভুক্ত লোকেরা নিজেদের দৃষ্টি দ্বারা উপভোগ করে, যা মূলত হারাম। কেননা আলেমদের ঐকমত্যে দাড়িবিহীন ব্যক্তির দিকে কামনাসহ দৃষ্টি দেওয়া হারাম কাজ। এমনকি কিছু আলেম কামবাসনা না জাগলেও দৃষ্টি দেওয়া হারাম হওয়ার মতকে সঠিক বলেছেন।

মহান আল্লাহ পুরুষদেরকে বলেছেন, ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ ‘মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য অধিক পবিত্রতার বিষয়, নিশ্চয়ই তারা যা করে, সে বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবহিত’ *(আন-নূর, ২৪/৩০)*।

নারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ ‘মুমিন নারীদেরকে

৪১. * ধলপুর লিচুবাগান জামে মসজিদ গেইট, বউ বাজার, সায়েদাবাদ, ঢাকা।

৪২. ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৫।

৪৩. মুসনাদে আহমাদ, হা/১৯৮২।

৪৪. মুসনাদে আহমাদ, হা/২৯১৩।

৪৫. ইবনুল হাজ্জ, আল মাদখাল, ২/৮-৯।

www.al-itisam.com

বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে' *(আন-নূর, ২৪/৩১)*। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ» 'কোনো পুরুষ অন্য কোনো পুরুষের গুপ্তাঙ্গের দিকে দৃষ্টি দেবে না এবং কোনো নারীও অপর কোনো নারীর গুপ্তাঙ্গে দৃষ্টি দেবে না। কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষের সাথে একই কাপড়ের নিচে অবস্থান না করে এবং কোনো নারী যেন অপর কোনো নারীর সাথে একই কাপড়ের নিচে অবস্থান না করে'।[৪৬]

২য় পর্যায়:

وَالطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ يَتَمَتَّعُونَ بِالْمُلَاعَبَةِ وَالْمُبَاسَطَةِ وَالْمُعَانَقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ عَدَا فِعْلِ الْفَاحِشَةِ الْكُبْرَى.

অর্থাৎ এই ২য় পর্যায়ের লোকেরা বড় অশালীন কাজে (ব্যভিচারে) লিপ্ত না হয়ে পরস্পর খেলাধুলা, হাতাহাতি, আলিঙ্গন প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে উপভোগ করে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ 'আর অশালীনতার ধারেকাছেও যাবে না, হোক তা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য' *(আল-আন'আম, ৬/১৫১)*।

৩য় পর্যায়:

فِعْلُ الْفَاحِشَةِ الْكُبْرَى.

অর্থাৎ বড় অশ্লীল কাজ (ব্যভিচার) সম্পাদন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِي سِتًّا فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ: إِذَا ظَهَرَ فِيهِمُ التَّلَاعُنُ، وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، وَلَبِسُوا الْحَرِيرَ، وَاتَّخَذُوا الْقِيَانَ، وَاكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ 'যখন আমার উম্মত পাঁচটি বিষয়কে হালাল মনে করবে, তখন তাদের উপর ধ্বংস আপতিত হবে— (১) যখন পরস্পরকে অভিশাপ করার বিষয় প্রকাশ পাবে, (২) মদপান করবে, (৩) রেশমি বস্ত্র পরিধান করবে, (৪) গায়িকাদের গ্রহণ করবে এবং (৫) পুরুষ পুরুষকে এবং নারী নারীকে (জৈবিক চাহিদা পূরণে) যথেষ্ট করে নেবে'।[৪৭]

এছাড়াও আরও একটি কাজ রয়েছে, যাকে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট পর্যায়ের সমকামিতা বলে উল্লেখ করেছেন। আমর ইবনু শুআইব রাহিমাহুল্লাহ তার পিতা ও তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى 'স্ত্রীর পিছন দিকে গমনের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এটা ছোট পর্যায়ের সমকামিতা'।[৪৮] ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই পুরুষের দিকে দৃষ্টি দিবেন না, যে অন্য পুরুষের কাছে (জৈবিক চাহিদা পূরণে) গমন করে কিংবা স্ত্রীর পায়ুপথে গমন করে'।[৪৯]

৪৬. তিরমিযী, হা/২৭৯৩।
৪৭. ছহীহ আত-তাগরীব ওয়াত তারহীব, হা/২৯৮৬।
৪৮. মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৯৬৭।
৪৯. ছহীহ আত-তাগরীব ওয়াত তারহীব, হা/২৪২৪।

সমকামিতা থেকে যে তওবা করতে চায়:

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ 'আর যে কোনো মন্দ কর্মে জড়িয়ে পড়ে কিংবা নিজের প্রতি যুলম করে ফেলে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহকে অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াময় হিসেবে পাবে' *(আন-নিসা, ৪/১১০)*। আব্দুল আযীয ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আপনার উপর এটা আবশ্যক যে, আপনি সমকামিতা ও হস্তমৈথুন থেকে দৃঢ়ভাবে সত্যনিষ্ঠ তওবা করবেন। এই দুটিই হারাম কাজ। সমকামিতা বেশি গুরুতর জঘন্য কাজ, কারণ এটা বড় পাপসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং সবচেয়ে বড় অপরাধসমূহের একটি'।[৫০]

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাস্তি:

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ 'তোমরা যাকে কওমে লূতের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত অবস্থায় পাবে, তবে সমকামী এবং যার সাথে সমকামিতা করা হয়, উভয়কে হত্যা করবে'।[৫১] মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ হাফিযাহুল্লাহ বলেন, وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَتْلِ اللُّوطِيِّ لَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي طَرِيقَةِ قَتْلِهِ অর্থাৎ 'ছাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, সমকামীকে হত্যা করতে হবে। তবে তার পদ্ধতি কী হবে সে বিষয়ে মতপার্থক্য আছে'।[৫২] যেমন আবূ নাযরাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা সমকামিতার শাস্তি কী হবে, সে ব্যাপারে বলেন, 'তাকে নগরের সবচেয়ে উঁচু কোনো কিছুর উপর থেকে অধোমুখে ফেলে দিয়ে উপর্যুপরি পাথর নিক্ষেপ করতে হবে'।[৫৩] ইয়াযীদ ইবনু ক্বায়েস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, أَنَّ عَلِيًّا رَجَمَ لُوطِيًّا অর্থাৎ 'আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু সমকামীকে রজম করেছেন'।[৫৪]

প্রায় একই কথা অন্যান্য সালাফদের থেকেও এসেছে। যেমন ইবনু শিহাব আয-যুহরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, اللُّوطِيُّ يُرْجَمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ؟ অর্থাৎ 'সমকামীদের রজম করতে হবে সে অবিবাহিত হোক কিংবা বিবাহিত'।[৫৫] ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যদি কাউকে দুইবার রজম করা সমীচীন হতো, তবে সমকামী ব্যক্তিকে (দুইবার) রজম করা হতো'।[৫৬] হাসান ও মুগীরা রাহিমাহুমাল্লাহ উভয়েই ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ থেকে আরও বর্ণনা করেন, حَدُّ اللُّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي অর্থাৎ 'সমকামিতার শাস্তি যেনার শাস্তির অনুরূপ'।[৫৭] অর্থাৎ বিবাহিত হলে রজম আর বিবাহিত না হলে ১০০ বেত্রাঘাত।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সমাজবিধ্বংসী, ঘৃণ্য ও অশালীন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৫০. binbaz.org
৫১. তিরমিযী, হা/১৪৫৬।
৫২. Islamqa.info
৫৩. সুনান আছ-ছগীর লি-বায়হাক্বী, হা/২৫৭২।
৫৪. শুআবুল ঈমান, বায়হাক্বী, হা/৫০০৬।
৫৫. শুআবুল ঈমান, বায়হাক্বী, হা/৫০০৭।
৫৬. শুআবুল ঈমান, বায়হাক্বী, হা/৫০০৮।
৫৭. শুআবুল ঈমান, বায়হাক্বী, হা/৫০০৯।

www.al-itisam.com

রাশিফল: মনস্তত্ত্ব, বাজারনীতি ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

-নাফিউল হাসান*

মনস্তাত্ত্বিক ও কনটেন্ট-ডিজাইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান সময়ের রাশিফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এতে একদিকে যেমন প্রচলিত জ্যোতিষশাস্ত্রের উপাদান রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে বাজারমুখী (Market-Oriented) কনটেন্ট তৈরির কৌশল। তবে রাশিফলের ভাষা ও গঠন বিশ্লেষণ করলে এটি মূলত পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখা (Audience Retention) এবং সম্পৃক্ততা (Engagement) বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিত বলে মনে হয়।

মনোবিজ্ঞানে একটি পরিচিত ধারণা হলো Barnum Effect, এর মাধ্যমে এমন কিছু সাধারণ বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়, যা অধিকাংশ মানুষ নিজের জীবনের সঙ্গে সহজেই মিলিয়ে নিতে পারে। যেমন— 'মানসিক চাপ বাড়তে পারে', 'নতুন সুযোগ আসতে পারে', 'খরচের ব্যাপারে সতর্ক থাকা ভালো', 'সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে' অথবা 'আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে'। এগুলো মানুষের জীবনে খুবই সাধারণ ও বহুল প্রচলিত অভিজ্ঞতা। ফলে পাঠকের মনে হয়, এ তো আমার জীবনেই ঘটছে!

রাশিফলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো Negative-Hope Balance। অর্থাৎ প্রথমে সামান্য উদ্বেগ বা আশঙ্কা তৈরি করা হয়, এরপর আশ্বাস দেওয়া হয়। যেমন— 'চাপ বাড়তে পারে, তবে শেষ পর্যন্ত আপনি পরিস্থিতি সামলে নিতে পারবেন' অথবা 'কিছু অস্থিরতা থাকবে, তবে পরে সবকিছু নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে'। এই কৌশলটি পাঠকের আবেগ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে এবং লেখার সঙ্গে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ (Psychological Attachment) তৈরি করে।

এ ধরনের লেখায় সাধারণত কর্মজীবন, সম্পর্ক, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, বিদেশযাত্রা ও বিবাহের মতো আবেগঘন বিষয়গুলোকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ এগুলো সাধারণ মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ ও প্রত্যাশার ক্ষেত্র। ফলে এসব বিষয় পাঠকের আগ্রহ বাড়ায় এবং কনটেন্টের পাঠকসংখ্যা, শেয়ার ও পুনরায় পাঠের প্রবণতা বৃদ্ধি করে।

ভাষাগত দিক থেকেও রাশিফল সাধারণত এমনভাবে লেখা হয়, যাতে তা সহজে ভুল প্রমাণ করা না যায়। যেমন— 'হতে পারে', 'সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে, 'ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে', 'অনুভব করতে পারেন'। এ ধরনের শব্দ ও বাক্যাংশ ব্যবহারের ফলে ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত হলেও তা সহজে যাচাই করা যায় না।

খেয়াল করলে দেখা যায়, অধিকাংশ রাশিফলের কাঠামো প্রায় একই ধরনের তথা প্রথমে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, তারপর কিছু সমস্যা বা দ্বন্দ্ব, পরিশেষে আশাবাদী সমাপ্তি। অর্থাৎ শুরুতে আত্মবিশ্বাস জাগানো হয়, মাঝখানে কিছু উদ্বেগের কথা বলা হয় এবং শেষে আশার বার্তা দেওয়া হয়। এই গল্পধর্মী কাঠামো (Storytelling Arc) পাঠককে পুরো লেখা পড়তে উৎসাহিত করে।

প্রচলিত বা Classical Astrology-তে সাধারণত গ্রহের অবস্থান, Houses, Transit, Aspect ইত্যাদি কারিগরি বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু আধুনিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত রাশিফলে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, অনুপ্রেরণামূলক ভাষা এবং জীবনধারাবিষয়ক পরামর্শের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। ফলে এটিকে পুরোপুরি ঐতিহ্যগত জ্যোতিষশাস্ত্র না বলে আধুনিক মিডিয়া-ভিত্তিক জ্যোতিষ কনটেন্ট বলা অধিকতর যৌক্তিক।

বড় বড় গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান এ ধরনের কনটেন্ট প্রকাশ করে, কারণ এটি তুলনামূলকভাবে কম খরচে তৈরি করা যায় এবং উচ্চমাত্রার পাঠক-সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে ওয়েবসাইটে পুনরাবৃত্ত ট্রাফিক, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার, পাঠকের সম্পৃক্ততা এবং বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি:

ইসলামের দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছেই রয়েছে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ 'বলুন, আসমানসমূহ ও পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না' *(আন-নামল, ২৭/৬৫)*।

অতএব, গ্রহ-নক্ষত্র মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য দিতে পারে এমন বিশ্বাস ইসলামে সমর্থিত নয়। তবে এখানে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) এবং ভাগ্যনির্ভর জ্যোতিষশাস্ত্র (Astrology) এক বিষয় নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান একটি বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়নের ক্ষেত্র, পক্ষান্তরে রাশিফল ও ভাগ্যগণনা বিশ্বাস ও অনুমানের উপর নির্ভরশীল।

উপসংহার:

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আলোকে রাশিফলকে পুরোপুরি ভুয়া বলে উড়িয়ে দেওয়া যেমন সরলীকরণ হবে, তেমনি এটিকে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবেও গ্রহণ করা যৌক্তিক নয়। বাস্তবে এটি এমন এক ধরনের গণমাধ্যমভিত্তিক কনটেন্ট, যেখানে জ্যোতিষ, অনুপ্রেরণামূলক লেখা এবং আচরণগত মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন কৌশল একত্রে ব্যবহার করে পাঠকের আগ্রহ ও সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করা হয়।

তবে মুসলিম সমাজে ভাগ্যনির্ভর বিশ্বাস ও কুসংস্কার প্রতিরোধের স্বার্থে রাশিফল প্রকাশ ও প্রচারের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে গণমাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় নেতৃত্বের গঠনমূলক ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

৫৮. * প্রকৌশলী (ইইই)।

বন্যায় সাপের উপদ্রব: প্রয়োজন সতর্কতা ও সচেতনতা

-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ*

বাংলাদেশে বর্ষা ও বন্যার মৌসুম এলেই সাপের উপদ্রব বেড়ে যায়। অতিবৃষ্টি ও বন্যার পানিতে সাপের গর্ত তলিয়ে গেলে তারা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে লোকালয়, বসতঘর, খড়ের গাদা, গোয়ালঘর ও শস্যক্ষেতে চলে আসে। ফলে এ সময় সাপে কামড়ানোর ঘটনাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রতি বছর দেশে বহু মানুষ সাপের কামড়ে আক্রান্ত হন। অনেকে মৃত্যুবরণ করেন, আবার অনেকেই দীর্ঘদিন শারীরিক অক্ষমতা কিংবা মানসিক আতঙ্কে ভোগেন। অথচ সময়মতো সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অধিকাংশ দুর্ঘটনাই এড়ানো সম্ভব। তাই বর্ষা ও বন্যাকালে সাপের উপদ্রব সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা আজ সময়ের দাবি।

সাপের অনুপ্রবেশ রোধে করণীয়:

সাপ প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো বসতবাড়ির পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। বাড়ির চারপাশের ঝোপঝাড়, লম্বা ঘাস, কাঠের স্তূপ, ভাঙা আসবাবপত্র ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। এসব স্থান সাপের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠতে পারে।

ঘরের দেয়াল, মেঝে, দরজা-জানালা কিংবা পাইপের চারপাশে থাকা গর্ত ও ফাটল দ্রুত বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কারণ এসব পথ দিয়েই অনেক সময় সাপ ঘরে প্রবেশ করে। বিশেষ করে বন্যার সময় এ বিষয়ে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন।

বাড়ির আশপাশে ময়লা-আবর্জনা জমিয়ে রাখা যাবে না। নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য ফেলতে হবে এবং নিয়মিত অপসারণ করতে হবে। ডাস্টবিন সবসময় ঢেকে রাখা উচিত। কারণ আবর্জনা ইঁদুরকে আকৃষ্ট করে, আর ইঁদুর হলো সাপের অন্যতম প্রধান খাদ্য।

বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা দূর করাও জরুরী। উঠান, ড্রেন, বাগান কিংবা ঘরের আশপাশে দীর্ঘ সময় পানি জমে থাকলে সাপসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রাণীর বিচরণ বাড়ে। তাই পানি দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

রাতে বাইরে চলাফেরা করলে টর্চ ব্যবহার করা উচিত। অন্ধকারে খালি পায়ে হাঁটা, ঝোপঝাড়ে হাত দেওয়া কিংবা খড়, ইট বা কাঠের স্তূপে হাত ঢোকানোর আগে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। গ্রামের মানুষ মাঠে কাজ করার সময় লম্বা বুট বা শক্ত জুতা ব্যবহার করলে ঝুঁকি অনেক কমে।

অনেকে গাঁদা ফুল, লেমনগ্রাস, রসুন বা কিছু সুগন্ধি তেল ব্যবহার করে সাপ দূরে রাখার চেষ্টা করেন। তবে এগুলোর কার্যকারিতা এখনো নিশ্চিতভাবে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয়। তাই এসব পদ্ধতির ওপর নির্ভর না করে পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

সাপে কামড়ালে কী করবেন?

সাপে কামড়ানোর পর সবচেয়ে বড় শত্রু হলো আতঙ্ক। ভয় পেলে হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, ফলে বিষ দ্রুত শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই আক্রান্ত ব্যক্তিকে সাহস দিতে হবে এবং যতটা সম্ভব শান্ত রাখতে হবে।

রোগীকে শুইয়ে রেখে কামড়ানো অঙ্গটি নাড়াচাড়া কম করতে হবে। সম্ভব হলে আক্রান্ত অঙ্গটি স্প্লিন্ট বা কাঠের সাহায্যে স্থির রাখা যেতে পারে। আংটি, চুড়ি, ঘড়ি বা আঁটোসাঁটো পোশাক খুলে দিতে হবে, কারণ আক্রান্ত স্থানে ফোলা দেখা দিতে পারে।

যদি নিরাপদ হয়, তবে সাপটির রং বা বৈশিষ্ট্য মনে রাখার চেষ্টা করুন অথবা দূর থেকে ছবি তুলুন। তবে কোনো অবস্থাতেই সাপ ধরতে বা মারতে যাবেন না।

এরপর যত দ্রুত সম্ভব নিকটস্থ হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। বিষধর সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে অ্যান্টিভেনমই সবচেয়ে কার্যকর চিকিৎসা। বাংলাদেশের জেলা সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে অ্যান্টিভেনমের ব্যবস্থা রয়েছে।

৫৯. * চিকিৎসক, কলামিষ্ট ও গবেষক; প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি।

যেসব ভুল কখনো করবেন না:

আমাদের সমাজে সাপে কামড়ানোর পর নানা ধরনের ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে, যা রোগীর জীবনকে আরও ঝুঁকির মধ্যে ফেলে।

কামড়ের স্থান কেটে রক্ত বের করার চেষ্টা করবেন না। মুখ দিয়ে বিষ চুষে বের করার চেষ্টা করবেন না। খুব শক্ত করে দড়ি, রশি বা ফিতা বেঁধে রক্ত চলাচল বন্ধ করবেন না। বরফ, আগুন, রাসায়নিক পদার্থ বা বৈদ্যুতিক শক প্রয়োগ করবেন না। অ্যালকোহল বা অপ্রয়োজনীয় ওষুধও খাওয়ানো উচিত নয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ওঝা, কবিরাজ বা কুসংস্কারনির্ভর চিকিৎসার ওপর নির্ভর করে মূল্যবান সময় নষ্ট করা যাবে না। সাপে কামড়ানোর একমাত্র গ্রহণযোগ্য চিকিৎসা হলো প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যান্টিভেনম ও অন্যান্য চিকিৎসা গ্রহণ।

বাংলাদেশে বিষধর সাপ সম্পর্কে কিছু তথ্য:

বাংলাদেশে প্রায় ৮০টি প্রজাতির সাপের অস্তিত্ব রয়েছে। এর অধিকাংশই নির্বিষ। তবে গোখরা, কালাচ, চন্দ্রবোড়া (রাসেলস ভাইপার), কিং কোবরা, সবুজ বোড়া প্রভৃতি কয়েকটি প্রজাতি অত্যন্ত বিষধর।

একটি প্রচলিত ভুল ধারণা হলো, সাপ কামড়ালেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বাস্তবে অধিকাংশ সাপই নির্বিষ এবং বিষধর সাপের কামড় হলেও সময়মতো হাসপাতালে নিয়ে গেলে অধিকাংশ রোগীকেই সুস্থ করা সম্ভব। তাই আতঙ্ক নয়, দ্রুত চিকিৎসাই জীবন বাঁচানোর প্রধান উপায়।

সচেতনতাই সর্বোত্তম প্রতিরোধ:

প্রতিরোধ সবসময় চিকিৎসার চেয়ে উত্তম। তাই বর্ষা ও বন্যাকালে পরিবারের সবাইকে সাপ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। শিশুদের ঝোপঝাড়, পানিবন্দী এলাকা কিংবা অন্ধকার স্থানে একা যেতে নিরুৎসাহিত করতে হবে। রাতে বাইরে বের হলে টর্চ ব্যবহার করতে হবে এবং ঘুমানোর আগে বিছানা, মশারি ও জুতার ভেতর ভালোভাবে দেখে নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

স্থানীয় প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং গণমাধ্যমেরও উচিত বর্ষা মৌসুমে সাপে কামড়ানোর ঝুঁকি ও করণীয় সম্পর্কে নিয়মিত জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা। একই সঙ্গে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে পর্যাপ্ত অ্যান্টিভেনমের সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

উপসংহার:

বর্ষা ও বন্যাকালে সাপের উপদ্রব একটি বাস্তব ও গুরুতর জনস্বাস্থ্য সমস্যা। তবে কিছু সাধারণ সতর্কতা, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার প্রতি আস্থা রাখলে এ ঝুঁকি অনেকাংশে কমানো সম্ভব। মনে রাখতে হবে, সাপে কামড়ানো মানেই মৃত্যু নয়। দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া, চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলা এবং কুসংস্কার পরিহার করাই জীবন রক্ষার সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

আসুন, আমরা নিজেরা সচেতন হই, পরিবার ও প্রতিবেশীকেও সচেতন করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সব ধরনের বালা-মুছীবত থেকে হেফাযত করুন– আমীন!

ঈদে মীলাদুন নবীর বাকি অংশ

মুসলিমদের করণীয়:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা তাঁর জন্মদিন উদযাপনের মধ্যে নয়; বরং তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ, তাঁর আদর্শ বাস্তবায়ন এবং তাঁর আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ ‘বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন’ *(আলে ইমরান, ৩/৩১)*।

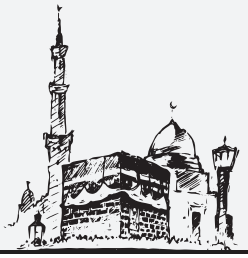
সুতরাং মুসলিমদের উচিত বিদআত থেকে বেঁচে থেকে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে অটল থাকা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনাদর্শকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে বাস্তবায়ন করা।

উপসংহার:

ইসলামে ইবাদত ও উৎসব নির্ধারিত হয় কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর মাধ্যমে। দ্বীনের মধ্যে নতুন কোনো ইবাদত বা উৎসব সংযোজনের সুযোগ নেই। তাই ঈদে মীলাদুন নবী উদযাপনের পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা এবং তাঁর অনুসরণে জীবন পরিচালনা করাই একজন মুমিনের প্রকৃত কর্তব্য।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর উপর অটল থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

www.al-itisam.com



হারামাইনের মিম্বার থেকে

দুনিয়ার ফিতনা থেকে সাবধান!

[২৬ যুলহিজ্জাহ, ১৪৪৭ হি. মোতাবেক ১২ জুন, ২০২৬ পবিত্র হারামে মাক্কীর (কা'বা) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ ফয়সাল ইবনু জামীল ইবনু হাসান গাযাওয়ী** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন **ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ**। খুৎবাটি 'মাসিক আল-ইতিছাম'-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা চাই। আমরা আমাদের নফসের অনিষ্ট ও আমলের মন্দ পরিণতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ সৎপথ প্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ করুন এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং মুসলিম না হয়ে কখনো মৃত্যুবরণ করো না' *(আলে ইমরান, ৩/১০২)*।

অতঃপর, দুনিয়ার জীবন কতই না তুচ্ছ ও মূল্যহীন! এখানে বিপদ-আপদ বারবার ফিরে আসে এবং এর দুঃখ-বেদনা নানাভাবে প্রকাশ পায়। এর স্বচ্ছতা ও সুখের সঙ্গে মিশে থাকে মলিনতা ও কষ্ট। এর মিষ্টতার পরেই আসে তিক্ততা। এর শুরু হয় কষ্ট দিয়ে, আর শেষ হয় ধ্বংস দিয়ে। এর আগমন প্রতারণাময়, আর এর প্রস্থান বেদনাদায়ক। এর ভোগ-বিলাস ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু এর পরিণতি স্থায়ী। এখানে হালাল ভোগের জন্য হিসাব দিতে হবে, আর হারাম ভোগের জন্য শাস্তি পেতে হবে।

এই দুনিয়া দ্রুত ধ্বংসশীল, অচিরেই এর পরিসমাপ্তি ঘটবে। এর জনপদ ধ্বংস হয়ে যায়, এর বাসিন্দারা মৃত্যুবরণ করে। ধীরে ধীরে এর সৌন্দর্য ম্লান হতে থাকে, এর আনন্দ-উল্লাস হারিয়ে যায় এবং এর সবুজ সজীবতাও একসময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপরও কত মানুষ এই দুনিয়ার ভালোবাসায় আকৃষ্ট হয়, এর চাকচিক্যের পেছনে নিজের আত্মাকেই বিকিয়ে দেয় এবং এর প্রবৃত্তির সাগরে ডুব দেয়। কতক মানুষ তো শুধু দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের জন্যই বেঁচে থাকে, তাদের পরকালীন জীবনের কথা একবারের জন্যও চিন্তায় আসে না। কাজেই সে ব্যক্তি সর্বদা এক নিরবচ্ছিন্ন দুশ্চিন্তা ও নিরন্তর ক্লান্তির মধ্যে জীবন কাটাতে থাকে।

হে আমার দ্বীনী ভাইয়েরা! অহীর দুই উৎস তথা কুরআন ও সুন্নাহর বাণীগুলো আমাদের সামনে এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রকৃত বাস্তবতাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। মহান আল্লাহ দুনিয়ার মর্যাদা যে তুচ্ছ এবং এর বিষয়-আশয় যে নগণ্য, তা বর্ণনা করে ইরশাদ করেন, 'তোমরা জেনে রাখো, দুনিয়ার জীবন তো কেবল ক্রীড়া-কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহংকার এবং ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা হলো বৃষ্টির মতো, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদের আনন্দ দেয়। তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও। অতঃপর তা খড়কুটায় পরিণত হয়। আর আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। বস্তুত দুনিয়ার জীবন তো প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়' *(আল-হাদীদ, ৫৭/২০)*।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেন, ‘হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব, দুনিয়ার জীবন যেন কোনোভাবেই তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং সেই মহাপ্রতারক (শয়তান) যেন আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রতারিত না করে’ *(ফাতির, ৩৫/৫)*।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, ‘আল্লাহ তাআলার নিকট যদি এই পৃথিবীর মূল্য মশার একটি পাখার সমানও হতো, তাহলে তিনি কোনো কাফেরকে এখানকার পানির এক ঢোকও পান করাতেন না’।[৬০]

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলিয়াহ অঞ্চল থেকে মদীনায় আসার পথে এক বাজার অতিক্রমকালে তার উভয় পাশে বেশ লোকজন ছিল। যেতে যেতে তিনি ক্ষুদ্র কানবিশিষ্ট একটি মৃত বকরির বাচ্চার পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার কাছে গিয়ে এর কান ধরে বললেন, ‘তোমাদের কেউ কি এক দিরহাম দিয়ে এটা ক্রয় করতে আগ্রহী?’ তখন উপস্থিত লোকেরা বললেন, কোনো কিছুর বদৌলতে আমরা এটা নিতে আগ্রহী নই এবং এটি নিয়ে আমরা কী করব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘তাহলে বিনা পয়সায় সেটা নিতে কি তোমরা আগ্রহী হবে?’ তারা বললেন, এ যদি জীবিত হতো, তবুও তো এটা ত্রুটিযুক্ত। কেননা এর কান হচ্ছে ছোট ছোট। আর এখন তো সেটা মৃত, আমরা কীভাবে তা গ্রহণ করব? অতঃপর তিনি বললেন, ‘আল্লাহর শপথ! এ তোমাদের কাছে যতটা নগণ্য, আল্লাহর কাছে দুনিয়া এর তুলনায় আরও বেশি নগণ্য’।[৬১]

হে মুমিন ভাইয়েরা! জ্ঞানী ও বিবেকবান সেই ব্যক্তি, যে সুস্পষ্ট উপলব্ধির সঙ্গে দুনিয়ার জীবন ও তার চাকচিক্যে প্রতারিত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং মানুষকেও এর ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করে। যেমন মহান আল্লাহ ফেরাউনের পরিবারের একজন ঈমানদার ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে ইরশাদ করেন, ‘হে আমার কওম! এ দুনিয়ার জীবন কেবল ক্ষণকালের ভোগ; আর নিশ্চয় আখেরাতই হলো স্থায়ী আবাস’ *(গাফির, ৪০/৩৯)*। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়ার জীবনে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ও এর প্রতি আসক্ত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন, ‘আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের জন্য দরিদ্রতার আশঙ্কা করি না। বরং আমি আশঙ্কা করি যে, তোমাদের কাছে দুনিয়ার প্রাচুর্য আসবে যেমন তোমাদের পূর্বেকার লোকেদের কাছে এসেছিল, তখন তোমরা সেটা পাওয়ার জন্য পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে, যেমনভাবে তারা করেছিল। আর এই প্রাচুর্য তাদেরকে যেমনিভাবে ধ্বংস করেছিল, তোমাদেরকেও তেমনিভাবে ধ্বংস করে দেবে’।[৬২]

উছমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দুনিয়া সবুজ-শ্যামল ও আকর্ষণীয় করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে, যার প্রতি বহু মানুষ ঝুঁকে পড়েছে। অতএব, তোমরা দুনিয়ার উপর নির্ভর করো না এবং এর প্রতি ভরসা রেখো না। কেননা এটি মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়।[৬৩]

অতঃপর হাসান বাছরী রহিমাহুল্লাহ-এর সামনে দুনিয়ার আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, দুনিয়া হলো ঘুমন্ত মানুষের স্বপ্নের মতো অথবা বিলীন হয়ে যাওয়া ছায়ার মতো। আর প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি কখনোই এমন বস্তুর দ্বারা প্রতারিত হয় না।[৬৪]

হে আল্লাহর বান্দাগণ! অনেক মানুষ এমন আছে, যাদের অন্তরকে দুনিয়ার মায়া শক্তভাবে প্রভাবিত করে এবং দুনিয়া তাদের অনুভূতি, চিন্তা ও বিবেককে পুরোপুরি অধিকার করে নেয়। ফলে তারা দুনিয়ার কামনা-বাসনায় ডুবে যায় এবং তার বিপথসংকুল উপত্যকায় বিচরণ করে ধ্বংস হয়ে যায়। এরাই সেসব মানুষ যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, ‘আর পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে’ *(আল-আনআম, ৬/৭০)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, ‘আর তারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে উৎফুল্লতায় আছে’ *(আর-রা‘দ, ১৩/২৬)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর যারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট আছে এবং তা নিয়ে পরিতৃপ্ত রয়েছে’ *(ইউনুস, ১০/৭)*। অতএব, পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষ তার উদ্দেশ্য, আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিদানের দিক থেকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ‘যে আখেরাতের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য তার ফসলে প্রবৃদ্ধি দান করি, আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তা থেকে কিছু দেই এবং আখেরাতে তার জন্য কোনো অংশই থাকবে না’ *(আশ-শূরা, ৪২/২০)*।

أقولُ قولي هذا، وأستغفرُ اللهَ لي ولكم.

৬০ . তিরমিযী, হা/২৩২০; সিলসিলা ছহীহা, হা/৯৪০।
৬১ . ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৫৭।
৬২ . ছহীহ বুখারী, হা/৪০১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৬১।
৬৩ . তারীখে তাবারী, ৪/৪২২।
৬৪ . ইবনুদ দুনইয়া, কিতাবুয যুহদ, পৃ. ৩১।

www.al-itisam.com

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি দুনিয়াকে পরীক্ষাক্ষেত্র এবং আখেরাতকে প্রতিদানের আবাস বানিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নাই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, 'তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথিকের মতো থাকো'।[৬৫] আল্লাহ তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি এবং তাঁর ছাহাবীগণের প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন।

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! একজন মুমিনের দুনিয়া সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত। দুনিয়ার প্রকৃত বাস্তবতা উপলব্ধি করে এর প্রতি অনাসক্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, ব্যক্তি সন্ন্যাসবাদ গ্রহণ করবে, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, কাজকর্ম ত্যাগ করবে অথবা আল্লাহ যে জিনিসগুলো হালাল করেছেন সেগুলোকে নিজের জন্য হারাম করে নেবে। বরং একজন মুমিন পৃথিবীকে আবাদ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছে। তার জন্য জীবিকা হিসেবে দুনিয়ার পবিত্র ও উত্তম নেয়ামত ভোগ করা বৈধ। তার জন্য হালাল উপার্জনের জন্য চেষ্টা করা এবং অপচয় ও অহংকার ছাড়াই শরীআতের সীমার মধ্যে থেকে তা ভোগ করা বৈধ। অনুরূপভাবে একজন মুমিনের দুনিয়াবিমুখতা তাকে দুনিয়ার সংস্কার ও কল্যাণ সাধনে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে সে তাওহীদ, ঈমান ও সুন্নাহর প্রচারের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার করে এবং শিরক, অকল্যাণ ও ফিতনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

দুনিয়ার নিন্দায় কুরআন ও সুন্নাহর যেসব বাণী এসেছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য পৃথিবী, জীবন বা সময়কে নিন্দা করা নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ায় সংঘটিত মন্দ কাজ, পাপাচার এবং আল্লাহর আনুগত্য থেকে মানুষের গাফেল হয়ে যাওয়াকে নিন্দা করা।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বাস্তব অর্থে দুনিয়া নিন্দিত নয়। বরং নিন্দা নির্দেশিত হয় মানুষের সেই কর্মের প্রতি, যা সে দুনিয়ায় সম্পাদন করে। অন্যথা দুনিয়াই হলো আখেরাতের ভিত্তি ও তার শস্যক্ষেত্র। এখানেই মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে, তাঁর পরিচয় লাভ করে, তাঁর যিকির করে এবং ভালোবাসা অর্জন করে। আর জান্নাতবাসীরা জান্নাতে যে সর্বোত্তম জীবন লাভ করবে, তা মূলত দুনিয়ায় তারা যা বপন করেছে তারই ফল। আর দুনিয়ার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

হে মুসলিম উম্মাহ! রাত ও দিনের অবিরাম অতিক্রম, মাস ও বছরের ক্রমাগত শেষ হয়ে যাওয়ার মধ্যেই বিবেকবান মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় উপদেশ ও শিক্ষা রয়েছে। এসম্পর্কে একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি বলেছেন, সে কীভাবে দুনিয়া নিয়ে আনন্দিত হয়, যার প্রতিটি দিন তার এক মাসকে ধ্বংস করে, প্রতিটি মাস তার এক বছরকে কমিয়ে দেয়, আর প্রতিটি বছর তার জীবনকে ক্ষয় করে দেয়? সে কীভাবে দুনিয়া নিয়ে আনন্দিত হয়, যার বয়স তাকে তার নির্ধারিত মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে, আর জীবন তাকে তার মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে?

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা সেই মনোনীত নবী ﷺ-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করুন, যিনি এই দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি ﷺ বলেন, 'এই দুনিয়ার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? আমার এবং দুনিয়ার উদাহরণ তো এমন এক আরোহীর মতো, যে একটি গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল, তারপর সেখান থেকে চলে গেল এবং ছায়াটিকে পিছনে ফেলে রেখে গেল'।[৬৬]

আহ! তাঁর দুনিয়াবিমুখতা কতই না মহান ছিল! অতএব, আপনারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলুন, তাঁর হেদায়াতের পথ অবলম্বন করুন এবং প্রতিপালকের এই নির্দেশ পালন করুন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করো' *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৬)*।

হে আল্লাহ! আপনার পথে সংগ্রামরত নিপীড়িতদের সাহায্য করুন, আপনার পথে জিহাদকারী ও দেশের সীমান্তরক্ষীদের সহায়তা করুন। আমাদেরকে আমাদের দেশ ও ঘরে নিরাপত্তা দান করুন। আমাদের নেতা ও শাসকদের সংশোধন করুন এবং আমাদের নেতৃত্ব এমন ব্যক্তিদের হাতে দিন, যারা আপনাকে ভয় করে এবং আপনার সন্তুষ্টিমূলক কাজের অনুসরণ করে।

হে আল্লাহ! ফিলিস্তীনে এবং বিশ্বের সর্বত্র আমাদের ভাইদের সহায় হোন। তাদের দুশ্চিন্তা দূর করুন, তাদের বিপদাপদ লাঘব করুন, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ঐক্য সুদৃঢ় করুন, তাদের বিষয়াদি নিজের দায়িত্বে নিন, তাদের ক্ষুধা দূর করুন, তাদের ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা দিন, তাদের বিচ্ছিন্নতাকে ঐক্যে পরিণত করুন, তাদের ছিন্নভিন্ন অবস্থাকে সুসংগঠিত করুন এবং তাদের পক্ষে কৌশল অবলম্বন করুন, তাদের বিরুদ্ধে নয়।

হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আমাদের দ্বীনকে যথোপযোগী করে দিন, যা আমাদের সকল বিষয়ের রক্ষাকবচ। আমাদের দুনিয়াকেও যথোপযুক্ত করে দিন, যেখানে রয়েছে আমাদের জীবন-জীবিকা। আর আমাদের আখেরাতকেও যথোপযোগী করে দিন, যেখানে হবে আমাদের প্রত্যাবর্তন। সর্বোপরি আমাদের জীবনকে আমাদের জন্য কল্যাণকর এবং মৃত্যুকে সকল অনিষ্ট থেকে মুক্তির কারণ বানিয়ে দিন- আমীন!

৬৫ . ছহীহ বুখারী, হা/৬৪১৬।

৬৬. তিরমিযী, হা/২৩৭৭; ইবনু মাজাহ, হা/৪১০৯, হাদীছ ছহীহ।

www.al-itisam.com

কুরআনের মর্মবাণী

রবের বাণী

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(পর্ব-৮)

[সূরা আল-বাক্বারাহ: ৩০-৩৫ আয়াত]

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

[আল-বাক্বারাহ: ৩০ আয়াত]

পূর্বের আয়াতে এসেছে, পৃথিবীর সকল কিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মানুষের অধীন করা হয়েছে। আর এই আয়াতে মহান আল্লাহ পরিষ্কার করে দিচ্ছেন যে, সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হলেও এগুলোর বিষয়ে মানুষের একচ্ছত্র আধিপত্য ও স্বাধীনতা নেই; বরং মানুষকে পৃথিবীর প্রতিনিধি তথা দায়িত্বশীল হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। পৃথিবীর সকল কিছুই তাদের কাছে মূলত আমানত। মানব সৃষ্টির সেই মহৎ উদ্দেশ্যের ঘটনার সারমর্ম হচ্ছে, পৃথিবীতে মানুষের পূর্বেও দীর্ঘদিন জিনদের বসবাস ছিল। তাদের পাপাচার, ফিতনা-ফাসাদের দীর্ঘ যাত্রার কোনো এক সময়ে মহান আল্লাহ একদিন মানুষ সৃষ্টির ইচ্ছা পোষণ করলেন। তিনি তাঁর সেই ইচ্ছার কথা ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে নতুন প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই। মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের সাথে পরামর্শ করছেন এমন নয়, বরং তাঁর সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন। ফেরেশতারা জিনদের দীর্ঘ তিক্ত অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে মহান আল্লাহকে বললেন, হে আল্লাহ! তাসবীহ পাঠ করার জন্য এবং পবিত্রতা ঘোষণা করার জন্য তো আমরাই যথেষ্ট, আবারও জিনদের মতো এমন এক জাতি সৃষ্টি করার কী প্রয়োজন আছে, যারা পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ তৈরি করবে। ফেরেশতারা মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেননি, বরং তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে মহান আল্লাহর হিকমা জানতে চেয়েছেন। আর এটিও মহান আল্লাহর দয়া যে, তিনিও ফেরেশতাদেরকে মানুষ সৃষ্টির হিকমা জানিয়ে দিচ্ছেন। মহান আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। তথা গায়েবের খবর ফেরেশতারাও জানতেন না। অদৃশ্যের খবর একমাত্র মহান আল্লাহই জানেন। মানুষ যে শুধু পাপাচার করবে এমন নয়; বরং তারা তওবাও করবে। তাদের মধ্যে মুহাম্মাদ ﷺ-এর মতো মহান নবীও থাকবেন। আল্লাহর রাস্তায় জীবনদানকারী শহীদরাও থাকবেন। এই অদৃশ্যের খবরগুলো শুধু মহান আল্লাহ জানতেন।

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

[আল-বাক্বারাহ: ৩১ আয়াত]

যাহোক মহান আল্লাহ আদম-সন্তানের সক্ষমতার প্রমাণ দেওয়ার জন্য তাৎক্ষণিক একটি ব্যবস্থা করলেন। তিনি আদম আলাইহিস সালাম-কে পৃথিবীর সকল সৃষ্টিজীবের নাম শিক্ষা দিলেন। আজকের যুগের বিমান, রকেট, মোবাইল, কম্পিউটারসহ সকল প্রযুক্তির জ্ঞান আদম আলাইহিস সালাম-এর ব্রেনে দেওয়া ছিল। তিনি সকল কিছু জানতেন। যুগের প্রয়োজনে বংশ পরম্পরায় সেই জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থেকেছে। জেনেটিক্যালি যা আদম আলাইহিস সালাম-এর জ্ঞানে ছিল না, তা মানুষ কোনোদিন আবিষ্কার করতে পারবে না। পিতার জ্ঞানে যা নেই, তা সন্তানের পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। কেননা শূন্য থেকে সৃষ্টি করার কোনো ক্ষমতা মানুষের নেই। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের ব্রেনের বিভিন্ন পর্দা খুলতে থাকে আর মানুষ নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করতে থাকে।

যাহোক, মহান আল্লাহ পৃথিবীর সকল সৃষ্টি ও আবিষ্কার ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং তাদের কাছে এগুলোর নাম জানতে চাইলেন। এভাবে নাম জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্য ফেরেশতাদের ছোট করা ছিল না; বরং পৃথিবীর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আদম-সন্তানের জ্ঞান, যোগ্যতা ও সক্ষমতা প্রদর্শন করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য।

৬৭. * ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বিএ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

www.al-itisam.com

﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾

[আল-বাক্বারাহ: ৩২ আয়াত]

ফেরেশতারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মহান আল্লাহকে জানালেন, হে আল্লাহ! আপনি মহাপবিত্র! আমরা তো ততটুকুই জানি, যতটুকু আপনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। এর বেশি কিছু আমাদের জানা নেই। আর প্রকৃত জ্ঞানী, সর্বজ্ঞাত ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাময় তো শুধু আপনিই। ফেরেশতাদের এই বিনয় প্রমাণ করে আদম আলাইহিস সালাম-এর যে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সেটাও মূলত আল্লাহরই দান। আদম-সন্তানও ততটুকুই জানে, যতটুকু মহান আল্লাহ শিখিয়েছেন। তাই ফেরেশতাদের এই বিনয় আদম-সন্তানকেও স্মরণে রাখা উচিত এবং কখনো ইবলীসের মতো জ্ঞানের বড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।

﴿قَالَ يَاآدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾

[আল-বাক্বারাহ: ৩৩ আয়াত]

এরপর মহান আল্লাহ আদম আলাইহিস সালাম-কে সেই সকল কিছুর নাম জানানোর জন্য বললেন। আদম আলাইহিস সালাম সকল কিছুর নাম জানিয়ে দিলেন। এর মাধ্যমে ফেরেশতাদের উপরে আদম আলাইহিস সালাম-এর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো। মানুষের মধ্যে ভালোমন্দ উভয় কাজ করার যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল এবং যা দেখে ফেরেশতারা মানুষের থেকে ফিতনা-ফাসাদের আশঙ্কা করছিলেন, মানুষের সেই ইচ্ছাশক্তিকে ভালো কাজে লাগানোর জন্য মানুষকে জ্ঞানও দেওয়া হলো। মানুষের জ্ঞানই মানুষকে পৃথিবীর দায়িত্ব পালনে, হেদায়াতের রাস্তায় থাকতে এবং কল্যাণের কাজে সহযোগিতা করবে। যাহোক, আদম আলাইহিস সালাম যখন এভাবে সব নাম বলে দিলেন, তখন মহান আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং ফেরেশতাসহ সকল সৃষ্টিজীবের অজ্ঞতা ও দুর্বলতা উল্লেখ করে বললেন, আমি তো তোমাদের বলেছিলাম, আসমান-যমীনের সকল অদৃশ্য জ্ঞান আমি রাখি। শুধু তাই নয়, তোমরা যা প্রকাশ কর, তাও জানি আর তোমরা যা গোপন কর, সেটাও জানি। এই বিষয়গুলো শুধু ফেরেশতাদের জন্য প্রযোজ্য নয়; বরং আদম-সন্তানের জন্যও প্রযোজ্য।

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

[আল-বাক্বারাহ: ৩৪ আয়াত]

আদম আলাইহিস সালাম-এর এই জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ার পর মহান আল্লাহ এর স্বীকৃতিস্বরূপ উপস্থিত সকলকে তাকে সিজদা করার আদেশ দিলেন। সেখানে উপস্থিতদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ফেরেশতা; তবে একজন জিনও ছিল, যার নাম ইবলীস। ইবলীস তার জ্ঞান ও দীর্ঘ ইবাদতের কারণে আসমানে ফেরেশতাদের সঙ্গে অবস্থান ও যাতায়াতের সুযোগ লাভ করেছিল। কিন্তু সে ফেরেশতা ছিল না, সে ছিল জিন।

তবে উপস্থিত সংখ্যা বেশিরভাগ ফেরেশতা হওয়ায় মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের নাম নিয়ে বললেন, হে ফেরেশতারা! তোমরা আদমকে সিজদা করো। ফেরেশতারা ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। নিজেদের জ্ঞান নিয়ে তাদের কোনো অহংকার ছিল না। তারা আগেই স্বীকার করেছিলেন যে, তারা ততটুকুই জানেন, যতটুকু আল্লাহ তাদের শিক্ষা দিয়েছেন। অদৃশ্যের জ্ঞান ও সব গূঢ় রহস্য একমাত্র মহান আল্লাহই জানেন। এই বিনয় ও আনুগত্যের কারণেই ফেরেশতারা কোনো দ্বিধা ছাড়াই সঙ্গে সঙ্গে সিজদায় অবনত হলেন।

কিন্তু ইবলীস ছিল ভিন্ন স্বভাবের। সে নিজের জ্ঞান ও মর্যাদা নিয়ে অহংকারে লিপ্ত ছিল। তাই সে পাল্টা যুক্তি দেখিয়ে বলল, মানুষ মাটি থেকে সৃষ্টি, আর আমি আগুন থেকে সৃষ্টি। সুতরাং আমার মর্যাদা মানুষের চেয়ে বেশি। তাই আদমকে সিজদা করা আমার জন্য অপমানজনক। এই অহংকার ও অবাধ্যতার কারণেই ইবলীস সিজদা করতে অস্বীকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

﴿وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

[আল-বাক্বারাহ: ৩৫ আয়াত]

আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ তার বাম পাঁজরের হাড় থেকে তার স্ত্রী হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি আদম আলাইহিস সালাম-কে বললেন, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো আর যা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে ভক্ষণ করো। তবে একটি নির্দিষ্ট গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। যদি এই গাছের নিকটবর্তী হও, তাহলে তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ চাইলে এই গাছ ভক্ষণ করার অনুমতি দিতে পারতেন, কিন্তু তখন আনুগত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কোনো মানদণ্ড থাকত না। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বতন্ত্র জ্ঞানের যে পরীক্ষা সেটি তখনই সম্ভব, যখন মানুষকে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা দেওয়া হবে। সীমারেখা মেনে চলার অর্থ পরাধীনতা নয়। কেননা আদম আলাইহিস সালাম-এর জন্য সমগ্র জান্নাতের সকল ফল ও সকল গাছ বৈধ ছিল। অর্থাৎ সে স্বাধীন ছিল, তবে সীমিত স্বাধীনতা; লাগামহীন স্বাধীনতা নয়। আর এটিই ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষের পরীক্ষার মানদণ্ড।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

www.al-itisam.com

উসওয়াতুন হাসানাহ

কুরআনুল কারীমের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভালোবাসা

-হাসান আল-বান্না মাদানী*

আল-কুরআনুল কারীম সমগ্র জগতের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহর বাণী। কুরআন মানবজাতির জন্য এক মহা নেয়ামত; এটি হেদায়াতের আলো, দয়ার প্রতীক, আরোগ্যের মাধ্যম, বরকতের উৎস এবং প্রশান্তির এক অনন্য অবলম্বন। কুরআন ও সৌভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কুরআনবিহীন জীবন যেন বৃষ্টিবিহীন শুষ্ক মাটি, ধু-ধু মরুভূমি কিংবা শুকিয়ে যাওয়া বৃক্ষের মতো। কুরআন থেকে দূরে সরে মর্যাদা প্রত্যাশা করা মানে মরীচিকায় তৃষ্ণা মেটানোর আশা করা। কুরআন ছেড়ে কিছুই অর্জিত হয় না, আর কুরআনকে আঁকড়ে ধরলে প্রকৃত অর্থে কিছুই হারিয়ে যায় না।

যেমন কেবল কথায় মধুর স্বাদ বোঝানো কঠিন, তেমনি শুধু শব্দে কুরআনের মাধুর্য প্রকাশ করাও অসম্ভব। মসজিদের আলমারিতে দীর্ঘদিন ধরে সাজিয়ে রাখা মুছহাফগুলোর দিকে তাকালে আমাদের বুক কষ্টে ভারী হয়ে ওঠা উচিত, চোখ অশ্রুসজল হওয়া উচিত এবং অন্তর লজ্জায় নত হয়ে যাওয়া উচিত।

যে জনপদে রাতে তাহাজ্জুদের সময়ে কুরআনের সুমধুর তেলাওয়াতের পরিবর্তে গান-বাজনার শব্দ ভেসে আসে, যেখানে নামধারী মুসলিম তরুণ-তরুণীরা প্রকাশ্যে অশালীনতায় মেতে ওঠে, সেখানে আবার কুরআনের প্রতিধ্বনি ফিরিয়ে আনতেই হবে।

কুরআনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেমন, এটি গভীর আত্মসমালোচনার বিষয়। আমরা যত দাবিই করি না কেন, বাস্তবতা অত্যন্ত বেদনাদায়ক!

নবী ﷺ সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন, তাই কুরআনের সাথে তাঁর সম্পর্কও ছিল সবার চেয়ে ভিন্ন ও গভীর। রাসূল ﷺ বড় কষ্ট ও আগ্রহের সাথে এ কুরআন গ্রহণ করতেন। যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একদিন রাসূল ﷺ -এর উপর অহী নাযিল হওয়ার সময় তাঁর উরু আমার উরুর উপর ছিল, আমি অনুভব করলাম যেন অহীর ভারে আমার উরু থেঁতলে গেল।[৬৯] আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দিনেও যখন রাসূল ﷺ -এর উপর অহী নাযিল হতো, তখন আমি দেখতাম যে তাঁর কপালের একপাশ দিয়ে ঘাম বয়ে যাচ্ছে।[৭০]

রাসূল ﷺ অতীব আগ্রহের সাথে কুরআনুল কারীম গ্রহণ করতেন এবং তা যত দ্রুত সম্ভব মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন। তাই যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম অহী তেলাওয়াত করে শোনাতেন, তখন তার তেলাওয়াত শেষ হওয়ার পূর্বেই অধীর আগ্রহে নবী ﷺ পড়তে শুরু করতেন।[৭১]

রাসূল ﷺ -কে তারতীল সহকারে কুরআন তেলাওয়াত করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তাই তিনি তারতীল সহকারেই কুরআন তেলাওয়াত করতেন। মা হাফছা রাযিয়াল্লা-হু আনহা রাসূল ﷺ -এর নফল ছালাতে তেলাওয়াত সম্পর্কে বলেন, তিনি এমন তারতীল সহকারে সূরা পাঠ করতেন যে, সূরাটি তার চেয়ে অধিক বড় সূরার থেকেও লম্বা হয়ে যেত।[৭২] আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু -কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূল ﷺ -এর তেলাওয়াত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রাসূল ﷺ মাদ্দের সাথে তেলাওয়াত করতেন। যেমন- বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম অর্থাৎ বিসমিল্লাহ-এ আল্লাহ শব্দটি মাদ্দের সাথে পড়তেন, রহমান-এ মীমকে মাদ্দের সাথে পড়তেন এবং আর-রহীম-এ হা কে মাদ্দের সাথে পড়তেন।[৭৩]

রাসূল ﷺ কুরআন দ্রুত পড়তেন না। তিনি প্রত্যেক আয়াতে থামতেন। উম্মু সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহা -কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূল ﷺ -এর তেলাওয়াত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রাসূল ﷺ এমনভাবে তেলাওয়াত করতেন যে, প্রত্যেকটি আয়াত পরবর্তী আয়াত থেকে আলাদা হয়ে যেত। একটি আয়াত তেলাওয়াত

৬৮. * কালিয়াচক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত; মুহাদ্দিছ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

৬৯. ছহীহ বুখারী, হা/২৮৩২।
৭০. ছহীহ বুখারী, হা/২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৩৩।
৭১. ছহীহ বুখারী, হা/৫০৪৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৭; তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮/২৮৬।
৭২. ছহীহ মুসলিম, হা/৭৩৩।
৭৩. ছহীহ বুখারী, হা/৫০৪৬।

www.al-itisam.com

করে থেমে যেতেন, তারপর দ্বিতীয় আয়াত তেলাওয়াত করতেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। আল-হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন। আর-রহমানির রহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন।[৭৪] উলামায়ে কেরাম বলেন, আয়াতের সমাপ্তি রাসূল ﷺ-এর থামার মাধ্যমেই জানা গেছে।

রাসূল ﷺ কী পরিমাণ তেলাওয়াত করতেন, তা বোঝার জন্য আমাদের রাসূল ﷺ-এর রাতের ছালাত সম্পর্কে জানতে হবে, রাসূল ﷺ রাতের ছালাতে কী পরিমাণ তেলাওয়াত করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, এক রাতে আমি নবী ﷺ-এর সাথে রাতের ছালাত আদায় করতে লাগলাম, তিনি এত লম্বা ক্বিয়াম করলেন যে, আমার মধ্যে এক খারাপ ইচ্ছা আসল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, সেই খারাপ ইচ্ছাটি কী? তিনি বললেন, আমার মন চাইল যে আমি রাসূল ﷺ-কে ছেড়ে বসে যাই।[৭৫] হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রামাযান মাসের কোনো এক রাতে আমি নবী ﷺ-এর কাছে এলাম। তিনি ছালাত আদায় করতে লাগলেন। তিনি পুরো সূরা আল-বাক্বারা তেলাওয়াত করলেন, তারপর সূরা আন-নিসা, তারপর সূরা আলে ইমরান...।[৭৬]

কুরআনুল কারীম রাসূল ﷺ-এর বক্ষে পূর্ণরূপে সংরক্ষিত ছিল এবং তিনি এক ঝাঁক ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম-কে কুরআন লিপিবদ্ধ করায় নিযুক্ত করেছিলেন। ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ তাদের সংখ্যা ২৩ জন উল্লেখ করেছেন। হেদায়াতপ্রাপ্ত চার খলীফা অর্থাৎ আবূ বকর, উমার, উছমান ও আলী এবং যায়েদ ইবনে ছাবেত, উবাই ইবনে কা'ব, মুআবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লা-হু আনহুম তাদের অন্তর্ভুক্ত।[৭৭]

রাসূল ﷺ ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম-সহ পুরো উম্মতকে কুরআন শেখা, শেখানো এবং পাঠ করার প্রতি উৎসাহিত করতেন। উক্ববা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা ছুফফায় বসেছিলাম। রাসূল ﷺ আমাদের কাছে আসলেন, অতঃপর বলতে লাগলেন, 'তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে প্রতিদিন সকালে বুত্বহান কিংবা আক্বীক্ব গিয়ে কোনো পাপ বা আত্মীয়তা ছিন্ন না করেই দুটি উঁচু কুঁজবিশিষ্ট উট পেতে চায়?' ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা সবাই তো এমন চাই। তিনি বললেন, 'তাহলে কেউ মসজিদে গিয়ে কুরআনের দুটি আয়াত শেখে না কিংবা পড়ে না কেন? সেই দুটি আয়াত তার জন্য দুটি উটের চেয়েও উত্তম। তিনটি আয়াত তিনটি উটের থেকে ভালো। চারটি আয়াত চারটি উটের থেকে অধিক মূল্যবান। এভাবে যতগুলো আয়াত পাঠ করবে, তত সংখ্যক উটের চেয়ে বড় নেয়ামত হাছিল করবে'।[৭৮] উছমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সেই, যে কুরআনের শিক্ষা অর্জন করে এবং মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়'।[৭৯]

রাসূল ﷺ চাইতেন যে, ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম যেন নিজে কুরআনের শিক্ষা অর্জন করেন, অপরকেও শিক্ষা দেন এবং এই ধারাবাহিকতা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

একটু ভেবে দেখুন, আপনি যদি সত্যিই কুরআনকে ভালোবাসেন, তাহলে কি কুরআন শেখার চেষ্টা করেছেন? অন্যদের শেখানোর চেষ্টা করেছেন?

আমরা যখন কোনো মসজিদে প্রবেশ করে সুমধুর তেলাওয়াত শুনি, তখন স্বাভাবিকভাবেই আশা জাগে যে, সেই এলাকার মানুষ কুরআনকে ভালোবাসে এবং এর যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করে। কিন্তু যদি দেখা যায়, মসজিদে এমন ব্যক্তি ইমামতি করছেন, যার কুরআন তেলাওয়াতের মৌলিক বিষয়গুলো পর্যন্ত শুদ্ধ নয়, যেমন- س ও ت, ص ও ط, ذ ও ض-এর উচ্চারণে ত্রুটি রয়েছে; মাদ্দ, গুন্নাহ ও ইখফার কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না, তাহলে বুঝতে হবে, সেই সমাজে কুরআনের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা ও গুরুত্বের ঘাটতি রয়েছে।

কারণ যে জাতি কুরআনকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে; তারা কুরআনের শুদ্ধ তেলাওয়াত, ছহীহ শিক্ষা এবং যোগ্য হাফেয ও ইমাম তৈরির ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নশীল হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কাছে যোগ্য ইমামের চেয়ে মসজিদের বাহ্যিক সৌন্দর্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মসজিদের প্রকৃত সৌন্দর্য তার ইট-পাথরে নয়; বরং শুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত, ইলম ও তাক্বওয়ার পরিবেশে।

নবী ﷺ-এর কথা অনুযায়ী যারা সর্বোত্তম, তাদেরকে ভালোবাসা কুরআনকে ভালোবাসার প্রমাণ; কারণ আপনি তাকে ভালোবাসবেন কুরআনের জন্য। কিন্তু যদি আপনি তাদেরকে অবহেলা করেন, তাদের থেকে দূরে থাকেন; তাহলে এটা আপনার কুরআন থেকে দূরে থাকার প্রমাণ। তাই আপনার দেখা উচিত, কেন আপনি কুরআন থেকে বঞ্চিত? আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ 'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি

৭৪. আহমাদ, হা/২৬৫৮৩।
৭৫. ছহীহ বুখারী, হা/১১৩৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৭৩।
৭৬. আহমাদ, হা/২৩৩৯৯।
৭৭. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫/৩৬১-৩৭৭।
৭৮. ছহীহ মুসলিম, হা/৮০৩।
৭৯. ছহীহ বুখারী, হা/৫০২৭।

www.al-itisam.com

অক্ষর পাঠ করে সে একটি নেকী পায় এবং আল্লাহ তাআলা সেটিকে ১০টি নেকীতে পরিণত করেন। আমি বলি না যে, আলিফ লাম মীম একটি অক্ষর; বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর'।[৮০]

রাসূল ﷺ অন্যের মুখ থেকে কুরআন শোনার আকাঙ্ক্ষা রাখতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, 'আমাকে একটু কুরআন শোনাও'। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কীভাবে আপনাকে কুরআন শোনাই, আপনার উপরই তো কুরআন নাযিল হয়েছে? রাসূল ﷺ বললেন, 'আমার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে যে, আমি অন্যের কাছ থেকে কুরআন শুনি'। তখন তিনি সূরা আন-নিসা তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন। যখন এই আয়াতটিতে পৌঁছালেন, ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيداً﴾ 'সেদিন কী অবস্থা হবে, যখন প্রত্যেক জাতির মধ্য হতে আমি একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং এদের (আপনার উম্মতের) সাক্ষীরূপে আপনাকে উপস্থিত করব' *(আন-নিসা, ৪/৪১)*। ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর দিকে চেয়ে দেখলাম কিংবা কেউ আমাকে ইঙ্গিত করল, তখন আমি দেখলাম যে, তার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে গেছে।[৮১] ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে, তার কান্নার সর্বাধিক সম্ভাব্য কারণ এই যে, তিনি জানেন, তিনি অবশ্যই সাক্ষ্য দেবেন এবং তার উম্মতের আমলে ঘাটতি থাকতে পারে, তাই তাদের শাস্তি হতে পারে।[৮২]

রাসূল ﷺ মনোযোগ সহকারে কুরআন শুনতেন, তখন বুঝতে পারতেন, তাই তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু বেরিয়ে আসত। আপনিও যদি মন দিয়ে কুরআন শোনেন, তাহলে উপলব্ধি করবেন যে, কুরআনের মাধুর্য অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। কুরআন অন্তরে একটি ভিন্ন অনুভূতি সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি কুরআনের আনন্দ একবার বুঝে নেবে, সে কখনো যেকোনো মূল্যেই তা হারাতে চাইবে না। কিছু মানুষ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে কুরআনের পরিবর্তে গান-বাজনাকে বাছাই করে নিয়েছে। গুনাহের গহ্বরে তারা এত গভীরে চলে গেছে যে, তাদের হৃদয়ে আর কুরআনের মাধুর্য পৌঁছায় না। অন্য দিকে একদল গযল ও নাশীদে মগ্ন হয়ে কুরআন থেকে উদাসীন হয়ে গেছে। ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কুরআনের পরিবর্তে কবিতা, গান, কোনো কথা বা কারো পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কুরআন পরিত্যাগ করার অন্তর্ভুক্ত।[৮৩]

রাসূল ﷺ কুরআনকে এত ভালোবাসতেন যে, কোথাও কুরআনের আওয়াজ পেলে থমকে দাঁড়িয়ে যেতেন। আবূ মূসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ তাকে বললেন, لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ 'যদি তুমি গত রাতে আমাকে দেখতে, যখন আমি তোমার তেলাওয়াত শুনছিলাম! তোমাকে দাউদ আলাইহিস সালাম-এর এক সুমধুর কণ্ঠ প্রদান করা হয়েছে'।[৮৪]

আমরা কি এমন এক সমাজ চাই না, যেখানে কোনো বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কুরআনের সুমধুর তেলাওয়াত কানে ভেসে আসবে? যেখানে ঘরে ঘরে কুরআনের আলো জ্বলবে, শিশুদের কণ্ঠে কুরআনের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হবে, আর প্রতিটি পরিবার কুরআনের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে তুলবে?

রাসূল ﷺ কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করতেন, তাই কখনো কখনো একটি আয়াতকে বারবার পড়ে যেতেন। আবূ যার গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ এক রাতে একটি আয়াত বারবার পড়তে থাকলেন, এমনকি এভাবে সকাল হয়ে গেল। আয়াতটি সূরা আল-মায়েদার ১১৮ নম্বর আয়াত।[৮৫]

কুরআন আমাদেরকে জীবনযাপনের সর্বোত্তম পদ্ধতি শিক্ষা দেয়। মানুষ হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ ও সুন্দর জীবনযাপন করতে চাইলে আর জান্নাতের পথে চলতে চাইলে, আমাদের জীবনকে কুরআনের আলোকে পরিচালিত করতে হবে। রাসূল ﷺ কুরআনকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করেছেন। যদি কেউ জানতে চায় যে, রাসূল ﷺ-এর চরিত্র কেমন ছিল, তাহলে তার কুরআন পড়া উচিত। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করা হয়, রাসূল ﷺ-এর চরিত্র কেমন ছিল? তিনি বলেন, তাঁর চরিত্র ছিল আল-কুরআন।[৮৬]

রাসূল ﷺ কুরআনের সমস্ত শিক্ষা নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন। তাই আমরা যদি সত্যিই রাসূল ﷺ-এর আদর্শ গ্রহণ করতে চাই, তাহলে আজ থেকেই আমাদের ভেবে দেখা উচিত, কুরআনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেমন হতে হবে।

দুঃখজনকভাবে, আমরা আল্লাহ তাআলার কালাম থেকে দূরে সরে শয়তানী ধ্বনি তথা গান-বাজনার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছি। এটি নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য এক গভীর দুর্ভাগ্য।

সম্মানিত পাঠক! কুরআনুল কারীম এমন এক মহান নেয়ামত যে, যেদিন আপনি এর প্রকৃত মর্যাদা ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারবেন, সেদিন থেকে আর কখনো এর থেকে দূরে যেতে চাইবেন না। বরং যদি আপনাকে বলা হয়, কুরআন পরিত্যাগ করার বিনিময়ে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ আপনাকে দেওয়া হবে, তবুও আপনি তা গ্রহণ করতে রাজি হবেন না। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

৮০. তিরমিযী, হা/২৯১০।
৮১. ছহীহ মুসলিম, হা/৮০০।
৮২. ফাতহুল বারী, ৯/৯৯।
৮৩. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৬/১০৮।
৮৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৭৯৩।
৮৫. নাসাঈ, হা/১০১০।
৮৬. আহমাদ, হা/২৫৮১৩।

www.al-itisam.com

ফাযায়েলে আমল

সূরা আল-ইখলাছ, সূরা আল-কাফিরূন ও সূরা আল-মুলক পাঠের ফযীলত

-মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)*

১. সূরা আল-ইখলাছ পাঠের ফযীলত:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ কি প্রতি রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অক্ষম?’ ছাহাবীগণ উত্তর করলেন, কী করে প্রতি রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়বে? তিনি বললেন, ‘সূরা قُلْ هُوَ اللهُ أحد কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান’।[৮৮] অর্থাৎ এতে কুরআনের মৌলিক তিন প্রকার জ্ঞানের আলোচনা রয়েছে— ক. তাওহীদ বা একত্ব, খ. আদেশ-নিষেধ ও আহকাম বা বিধি-বিধান এবং গ. কিচ্ছা বা অতীতের সংবাদ ও উপদেশমালা। আর এই সূরাতে তাওহীদের বিবরণ রয়েছে। সুতরাং এটা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, أَنَّ رَجُلًا قال: يا رسولَ اللهِ إني أُحِبُّ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}: هذه السورةَ একদা এক ব্যাক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই সূরা أحد قل هو الله কে ভালোবাসি। তখন তিনি বললেন, إِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ 'তোমার উক্ত সূরাকে ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দিবে'।[৮৯]

২. সূরা আল-কাফিরূন পাঠের ফযীলত:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘(ছওয়াবের দিক দিয়ে) সূরা قُلْ هُوَ اللهُ أحد’ কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান’।[৯০]

একদা ছাহাবী নাওফাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি জিনিস শিখিয়ে দিন, যা আমি শয্যা গ্রহণকালে পড়তে পারি। তিনি বললেন, قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ পড়বে। কেননা এর মাধ্যমে শিরক থেকে নিরাপত্তা লাভ করা যায়’।[৯১]

শিক্ষা: উক্ত সূরাদ্বয়ের অত্যধিক মর্যাদার কারণেই তাওয়াফ শেষে দুই রাকআত, ফজর ও মাগরিবের দুই রাকআত সুন্নাতে, তিন রাকআত বিশিষ্ট বিতর ছালাতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকআতসহ আরও অন্যান্য সুন্নাত ছালাতে সূরা আল-কাফিরূন ও আল-ইখলাছ পড়ার কথা হাদীছে এসেছে।

৩. সূরা আল-মুলক পাঠের ফযীলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: .إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কুরআন মাজীদে ৩০ আয়াতের একটি সূরা আছে, যা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছে, ফলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। সেই সূরাটি হচ্ছে تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ’।[৯২] সম্ভবত আল্লাহ তাআলা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উক্ত ঘটনা জানিয়েছেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُورَةُ تَبَارَكَ هِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘সূরা আল-মুলক তার তেলাওয়াতকারীর জন্য কবরের আযাব থেকে বাধা প্রদানকারী’।[৯৩]

৮৭* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
৮৮. ছহীহ বুখারী, হা/৫০১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৮১১; মিশকাত, হা/২১২৭।
৮৯. ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৭; মিশকাত, হা/২০২৭।
৯০. তিরমিযী, হা/২৮৯৪; মিশকাত, হা/২০৫২, এই বর্ণনাটি যদিও দুর্বল কিন্তু অন্য বর্ণনার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য।
৯১. আহমাদ, হা/২৪০০৯; তিরমিযী, হা/৩৪০৩, হাসান।
৯২. আহমাদ, হা/৭৯৭৫; তিরমিযী, হা/২৮৯১; আবূ দাউদ, হা/১৪০০; ইবনু মাজাহ, হা/৩৭৮৬; মিশকাত, হা/২০৪৯, হাসান।
৯৩. হাকেম, হা/৩৮৩৯; সিলসিলা ছহীহা, হা/১১৪০, হাসান ছহীহ।

www.al-itisam.com

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, অতঃপর...

-রাকিব আলী*

[১]

জীবনে চলার পথে আমরা একে অপরের বিপদ-আপদে সাহায্য করে থাকি। সাহায্য করার বিষয় থেকেই মূলত কৃতজ্ঞতার বিষয়টি আসে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের অনেক বড় একটি গুণ। এই গুণ মানুষের মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। অথচ মানুষের কাছ থেকে এই সুন্দর গুণটি কি-না দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যে অনেক বড় একটি বিষয়, তা যেন আমাদের অনেকের উপলব্ধিতেই আসে না। মূলত, কারো কাছ থেকে উপকৃত হলে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়। মানুষ কারো উপকার করলে সে চায় উপকৃত ব্যক্তিটি যেন তার প্রতি অন্তত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর সেটা হাসিমুখে সামান্য ধন্যবাদ বলার মাধ্যমেও হয়ে থাকে, এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুরুত্ব একটি হাদীছ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না’।[৯৫]

আপনি তখনই বুঝবেন যে, আপনি আপনার রবের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পেরেছেন, যখন দেখবেন আপনি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারছেন। অন্যথা মানুষের প্রতি অকৃতজ্ঞতা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার নামান্তর। আর যে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, সেই আল্লাহর প্রতি আপনি অকৃতজ্ঞ- কথাটি কি আবারও ভেবে দেখবেন?

কোনো মানুষ উপকার করার পর তার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করলে সে মানুষটি পরবর্তীতে আরও উপকার করতে উৎসাহ পায়। তখন সে মানুষের উপকারে নিজেকে আরও বেশি আত্মনিয়োগ করার চেষ্টা করে এবং তার মধ্যে আনন্দ কাজ করে।

কৃতজ্ঞতা আদায় না করলে কেমন জানি বিষয়টি এরকম দাঁড়ায়- যে মানুষটি আপনার উপকার করল, সে মানুষটির প্রতি আপনি সন্তুষ্ট নন, সে মানুষের কৃত উপকারকে আপনি তুচ্ছ মনে করছেন কিংবা আপনি তার কৃত উপকারকে উপকারই মনে করছেন না। এগুলো সবই চরম অকৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর বৈশিষ্ট্য। এজন্য কোনো মানুষ আমাদের কোনো উপকার করলে এমনকি ছোট্ট কোনো উপকার করলেও তার প্রতি গোমড়া মুখ না রেখে হাসিমুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কখনোই ভাবখানা এমন করে রাখা উচিত নয়, যেন সে কোনো উপকারই করেনি। এমন আচরণ খুবই কষ্টদায়ক। আমাদের দ্বারা নীরবে যেন এমন কোনো অকৃতজ্ঞ আচরণ করা না হয়, যে আচরণ অন্যকে কষ্ট দেয়, যে আচরণ অন্যের হৃদয়ে প্রবলভাবে দাগ কেটে যায়।

একটি কথা মনে রাখবেন, আপনি কারো উপকার করার পর উপকৃত ব্যক্তিটি যেমন আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আপনার নিজের খারাপ লাগে, ঠিক তেমনি অন্যের বেলায়ও একই বিষয় চিন্তা করবেন। যে আচরণ আপনার নিজের বেলায় খারাপ লাগার ও কষ্টের কারণ হয়, সেই একই আচরণ অন্যের বেলায়ও করবেন না, কখনোই নয়!

[২]

‘তাকে আমি খাওয়ালাম বা ট্রিট দিলাম, তার বিপদ-আপদে তাকে আমি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে তার পাশে দাঁড়ালাম, তাকে আমি বিভিন্ন সময় টাকা-পয়সা বা এটা-সেটা দিয়ে সাহায্য করলাম, তার আমি এত উপকার করলাম আর সে কি-না আমাকে সামান্য ধন্যবাদটুকু পর্যন্ত দিল না’- এমন বাক্য হরহামেশাই আমাদের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়ে থাকে। আর এগুলো নিঃসন্দেহে হীন মানসিকতার পরিচয় বহন করে। কিছু কিছু মানুষ আছে, যারা কারো সামান্য উপকার করলেই অন্যদেরকে গদগদ করে বলে বেড়ায়। এটাতেই তাদের যত আনন্দ। আর হবেই-বা না কেন, তারা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেনি, মানুষকে বলে বেড়ানোর জন্য করেছে। এদের আচরণ পুকুরের শৈবালের মতো। কথায় বলে, ‘শৈবাল দীঘিরে বলে উচ্চ করি শির, লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির’।

কারো প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া যেমন মোটেও কাম্য নয়, তেমনি কেউ অকৃতজ্ঞ আচরণ করে ফেললে তার সাথে রাগ করা, তাকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করা কিংবা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাও কাম্য নয়। কেননা আল্লাহর নেককার বান্দাগণ কখনো মানুষের কৃতজ্ঞতা পাওয়ার আশায় কারো উপকার করে না। তাদের প্রতি

৯৪* আম্বরখানা, সিলেট।
৯৫. আবূ দাঊদ, হা/৪৮১১।

কারো অকৃতজ্ঞ আচরণে তাদের কিছু আসে যায় না। তাদের চিন্তা মানুষ পর্যন্ত নয়, বরং তাদের চিন্তা স্বয়ং তাদের মহান রব পর্যন্ত। রব কীসে খুশি হবেন বা না হবেন, সেটাই সবসময় তাদেরকে ভাবিয়ে তুলে। তারা মানুষের কাছ থেকে প্রতিদান নিতে চায় না, নিতে চায় কেবল জান্নাতের মালিকের কাছ থেকে।

এটা অস্বীকার করা যায় না যে, কারো উপকার করলে সে যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে কিংবা অকৃতজ্ঞ আচরণ করে, তবে খুবই খারাপ লাগে। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দা কখনো মানুষের উপকার করে মানুষের কৃতজ্ঞতা পাওয়ার আশায় বসে থেকে নিজেকে কষ্টের আগুনে পোড়ায় না। কারণ সে মানুষের উপকার করে কেবলই তার রবের সন্তুষ্টির আশায়। রবকে খুশি করাই তার একমাত্র লক্ষ্য। সে বরং সবসময় এই ভয়ে থাকে যে, তার করা উপকার আদৌ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকে কেন্দ্র করে করা হলো কি-না তথা আমলে 'রিয়া' থেকে গেল কি-না, এটাই বরং তাকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলে। ফলশ্রুতিতে মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল কি-না এসব কখনো তার চিন্তায় ঠাঁই পায় না।

মনে রাখবেন, রবকে খুশি করার জন্য কারো উপকার করলে কোনো কিছু হারানোর থাকে না; কিন্তু মানুষকে খুশি করার উদ্দেশ্যে উপকার করলে হারানোর অনেক কিছু থাকে। ঠিক এই বিষয়টি যত দ্রুত বুঝা যাবে, ততই নিজেকে কষ্টের আগুনে পোড়ানো থেকে বাঁচানো যাবে, আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার লাভের আশায় নিজ সাধ্য অনুযায়ী মানুষের উপকারে লেগে থাকা যাবে এবং নিরুৎসাহিত হওয়ার ব্যাপারটি আপনার কাছ থেকে দূরে থাকবে। মানুষের উপকারের পিছনে একমাত্র রবের সন্তুষ্টির বিষয়টি আপনাকে পুরস্কার পাওয়ার আশায় বুক বাঁধতে সাহায্য করবে। অপরদিকে মানুষের সন্তুষ্টির বিষয় একসময় হতাশা ও দুশ্চিন্তায় রূপ নিবে। তখন ভীষণ এক কষ্ট অনুভব করবেন।

যখন কোনো মানুষ উপকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে উপকার পেয়েও তার সাথে অকৃতজ্ঞ আচরণ করে, এমন ভাব করে যেন লোকটি তার কোনো উপকার-ই করেনি, সর্বোপরি সদম্ভে এড়িয়ে চলে; তখন তাদের এমন কর্মকাণ্ড দেখে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হয়, জানেন? সে কেবল মনে মনে মুচকি হাসে এবং রবের নিকট অকৃতজ্ঞ আচরণ করা লোকটির জন্য হেদায়াতের দু'আ করে, যেন সে অন্তত অন্য কারো সাথে আর এমন আচরণ না করে, যে আচরণ মানুষের উপকারে এগিয়ে আসতে পরোক্ষভাবে নিরুৎসাহিত করে এবং নীরবে অন্তরে ছাপ রেখে যায়।

এমন নেককার লোকেরা কখনো কাউকে এভাবে বলে বেড়ায় না যে, আমি অমুক অমুককে এই এই সাহায্য করেছি; অথচ তারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল না, আমাকে চিনল না। কারণ একটাই, মানুষের উপকার করার তাদের একমাত্র কারণই হচ্ছে রবের সন্তুষ্টি হাছিল করা, অন্য কারো সন্তুষ্টি নয়।

আপনি কি জানেন, এমন মানুষদের ব্যাপারে রব কী বলেছেন? রব শুরুতেই তাদের প্রশংসা করে বলেছেন, 'তারা (নেককারগণ) শুধু আল্লাহর ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ফকীর, মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদিদের খাবার দেয়। আর এই সাহায্য করার সময় তারা বলে, আমরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তোমাদের খাবার দিচ্ছি, বিনিময়ে আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোনো রকম প্রতিদান ও কোনো রকম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন চাই না। আমরা তো সেই দিনের ব্যাপারে আমাদের মালিককে ভয় করি, যে দিনটি হবে অতীব ভয়ংকর। তারা যেহেতু এ দিনটিকে বিশ্বাস করেছে, তাই আল্লাহ তাআলা আজ তাদের সে দিনের যাবতীয় অনিষ্ট বা ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন, তিনি তাদের সজীবতা দান করবেন' *(আদ-দাহর, ৭৬/৮-১১)*।

কিয়ামতের সেই কঠিন দিনে আপনজন একজন আরেকজনকে চিনবে না, যেদিন উত্তপ্ত সূর্য মাথার একেবারে নিকটবর্তী থাকবে, যেদিন মানুষের মধ্যে পেরেশানি থাকবে, যেদিন মানুষ চরম আতঙ্কিত হয়ে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করতে থাকবে; সেদিন যদি আপনি সকল পেরেশানি থেকে মুক্তি পেতে চান এবং রবের বিশেষ অনুগ্রহ পেতে চান, তাহলে অবশ্যই মানুষকে সাহায্য করে তার কৃতজ্ঞতা পাওয়ার আশায় বসে থাকবেন না কিংবা মানুষটির অকৃতজ্ঞ আচরণের কারণে নিন্দার ঝড় বইয়ে দিবেন না।

মানুষের উপকার করে মানুষের কৃতজ্ঞতা পাওয়ার আশায় নিজেকে অপেক্ষমান না রেখে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি বলে তাদেরকে এড়িয়ে না চলে, তাদের সাথে তাদের মতো পাত্তাহীন আচরণ না করে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহর নিকট থেকে পরকালে বড় পুরস্কার লাভের আশায় নিজেদের জায়গা থেকে আমাদের যা যা করে যাওয়া প্রয়োজন তা-ই বিনাবাক্যে করে যাওয়া উচিত। এতে অন্যরকম এক মানসিক প্রশান্তি রয়েছে। অন্যথা মানুষের কৃতজ্ঞতা পাওয়ার আশায় বসে থাকলে মনের মধ্যে এক ধরনের অশান্তি কাজ করবে। আর মুমিন সবসময় অশান্তির কাজ এড়িয়ে চলে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন- আমীন!

নারীদের পাতা

মহিলাদের মসজিদে ছালাত আদায়: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

-মো. মাযহারুল ইসলাম*

ভূমিকা: মহিলাদের মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত একটি জায়েয বিষয়। যুগে যুগে ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈনের আমলেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে আমাদের সমাজে কিছু মানুষ মাযহাবগত কঠোরতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুসরণের কারণে এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। তারা বিভিন্ন যুক্তি ও দলীলের ভিত্তিতে মনে করেন, মহিলাদের মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করা উচিত নয়।

এমন মতভেদ থাকার কারণে অনেক সময় সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং সহনশীল পরিবেশ বাধাগ্রস্ত হয়। তাই আমরা পাঠকদের সামনে সংক্ষিপ্তভাবে বিশুদ্ধ দলীলের আলোকে বিষয়টি তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভব করছি। যেন সবাই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন, সহনশীলতার সাথে মতভেদকে মূল্যায়ন করতে পারেন এবং সঠিক জ্ঞান অনুযায়ী আমল করতে পারেন।

নারীদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি সংক্রান্ত হাদীছসমূহ:

মহিলাদের মসজিদে ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে গমন করার ব্যাপারে একাধিক ছহীহ হাদীছ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কিছু হাদীছ নিম্নে পেশ করা হলো—

১. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ‘তোমরা আল্লাহর বান্দীদের (মহিলাদের) মসজিদে যেতে নিষেধ করো না’।[৯৭]

২. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّيَنَ فِي الْمَسَاجِدِ ‘তোমরা আল্লাহর বান্দীদের (মহিলাদের) মসজিদে ছালাত আদায়ে নিষেধ করো না’।[৯৮]

৩. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, لاَ تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ ‘তোমরা তোমাদের নারীদের রাতের বেলা মসজিদে যেতে বাধা প্রদান করো না’।[৯৯]

৪. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ ‘তোমাদের নারীর যখন তোমাদের কাছে মসজিদে যেতে অনুমতি চাইবে, তখন তোমরা মসজিদে যেতে অনুমতি দিয়ো’।[১০০]

৫. আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْيَخْرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ تَفِلاَتٍ ‘তোমরা আল্লাহর বান্দীদের (নারীদের) মসজিদে যাওয়া থেকে বাধা দিয়ো না, তারা যেন সুগন্ধিবিহীন বের হয়’।[১০১]

৬. আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ ‘নারীরা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ফজরের ছালাত আদায় করতেন, অতঃপর তারা চাদর মুড়ি দিয়ে বের হয়ে যেতেন, ফলে তাদেরকে অন্ধকারের কারণে চেনা যেত না’।[১০২]

৭. আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ‘যে মহিলা সুগন্ধি জাতীয় বস্তু শরীরে লাগিয়েছে, সে যেন এশার ছালাতে উপস্থিত না হয়’।[১০৩]

৮. উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর স্ত্রী আতিকাহ বিনতু যায়েদ, তিনি উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর নিকট অনুমতি চাইলেন মসজিদে ছালাত আদায়ের

৯৬. * শিক্ষক, রাযিয়া হিফযুল কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক একাডেমি, দিনাজপুর।
৯৭. ছহীহ বুখারী, হা/৯০০।
৯৮. ছহীহ বুখারী, হা/৯০০; ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৮; মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/৬৭৪।
৯৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৪২।
১০০. ছহীহ বুখারী, হা/৮৬৫; ছহীহ মুসলিম, ১৩৮/১০১৯।
১০১. দারেমী, হা/১২৭৯; ইবনু খুযায়মা, হা/১৬৭৯।
১০২. ছহীহ বুখারী, হা/৮৬৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৯১; আবূ দাঊদ, হা/৪২৩; নাসাঈ, হা/৫৪৫।
১০৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১০২৬; আবূ দাঊদ, হা/৪১৭৭।

www.al-itisam.com

জন্য। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু চুপ থাকলেন। অতঃপর তিনি (আতিকাহ) বললেন, وَاللهِ لَأَخْرُجَنَّ إِلَّا أَنْ تَمْنَعَنِي فَلَا يَمْنَعُهَا ‘আল্লাহর কসম! আমাকে তুমি নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করার জন্য বের হব। অতঃপর উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু তাকে নিষেধ করেননি’।[১০৪]

৯. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর স্ত্রী যায়নাব আছ-ছাকাফিয়্যাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تُطَيِّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ‘যখন তোমাদের কেউ এশার জামাআতে আসবে, তখন যেন সে সুগন্ধি স্পর্শ না করে’।[১০৫]

১০. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, وَلَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ‘তোমরা তোমাদের নারীদের মসজিদে যাওয়াতে বাধা দিয়ো না। তবে তাদের জন্য তাদের বাড়িই উত্তম’।[১০৬]

এছাড়াও এ সংক্রান্ত আরও হাদীছ হাদীছের অন্যান্য কিতাবে বিদ্যমান।

ফিক্বহী অবস্থান:

মসজিদে গিয়ে নারীদের ছালাত আদায় শরীআতে স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। এটা ওয়াজিব নয়, বরং জায়েয। তবে তার হুকুম নিয়ে ইমামদের মধ্যে বেশ কিছু অভিমত পাওয়া যায়।

নারীরা মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতে পারবে কি-না এই ব্যাপারে বিশেষ করে চার ইমামের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান।

১. ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ রাহিমাহুমুল্লা-হু-এর মত হলো, মহিলারা মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতে পারবে। কেননা এ ব্যাপারে হাদীছ বিদ্যমান।[১০৭]

২. ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লা-হু এই মতের বিপরীতে অবস্থান করেছেন। তবে পরবর্তীতে তাদের মধ্যে দুই দলে বিভক্ত হয়েছে। একদলের মতে মসজিদে ছালাত আদায় করতে পারবে, আরেক দলের মতে মহিলারা মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতে পারবে না।[১০৮]

তবে উলামায়ে কেরামের মধ্যে যারা নারীদের মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, তারা খুব শক্ত করে মত প্রদান করেছেন, বিশেষ করে যুবতি ও বৃদ্ধা নারীর ক্ষেত্রে। কেননা তাদের উপর মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করা আবশ্যক নয়।

যারা মহিলাদের মসজিদে ছালাত আদায়ের বিপক্ষে তাদের দলীল ও তার প্রত্যুত্তর:

আমরা একাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করেছি যে, নারীরা মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতে পারবে। যে সকল হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে দু’টি দিক স্পষ্ট, তা হলো যদি কোনো মহিলা মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতে চায়, তাহলে তার স্বামীর অনুমতি লাগবে, আর অন্যটি হলো সুগন্ধি ব্যবহার করে যাওয়া যাবে না। এই দুইটি বিষয় ব্যতিরেকে মহিলাদের মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতে নিঃসন্দেহে ইসলামী শরীআত বৈধতা প্রদান করেছে। এই সকল দলীল প্রমাণ থাকার পরও যারা মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করার বিপক্ষে তারা দলীল হিসেবে পেশ করেন মা আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর একটি বক্তব্য, যেখানে তারা নিষেধের পক্ষে অবস্থান করে সেই হাদীছ পেশ করেন। দলীলটি হলো—

মা আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ‘যদি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজকের দিনে নারীদের পেতেন, তাহলে তাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন, যেভাবে বনূ ইসরাঈলের নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল’।[১০৯]

এই হাদীছের আলোকে হানাফী মাযহাবের কতিপয় আলেম মহিলাদের মসজিদে ছালাত আদায়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে থাকেন। অথচ এই হাদীছ নিষেধকে নাকচ করে, বরং মসজিদে যাওয়ার বিষয়টিকেই সাব্যস্ত করে। কারণ এখানে লক্ষ করুন! যদি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতেন আজকের যুগে নারীদের, তাহলে তিনি তাদের মসজিদে যেতে বাধা প্রদান করতেন।

এখানে লক্ষণীয় যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে শরীআতের আদেশ-নিষেধ জারি করা হবে। তিনি একাধিক হাদীছে মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার বিষয়কে বৈধতার অনুমোদন দিয়েছেন। এখন কেউ যদি নিষেধাজ্ঞার দলীল দেয় যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের মসজিদে ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে যাওয়াকে নিষেধ করেছেন, সেক্ষেত্রে তাকে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ দলীল পেশ করতে

১০৪. মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/৬৭৬।
১০৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১০২৪; নাসাঈ, হা/৫১৩০।
১০৬. আবূ দাঊদ, হা/৫৬৭।
১০৭. শারহুল মুমতি‘, ৩/৯০।
১০৮. আল-মুহাল্লা, ৪/১২৯; আল-বাদায়িউছ ছানায়ি‘, ৩/৮৬।
১০৯. ছহীহ বুখারী, হা/৮৬৯; ইবনু খুযায়মা, হা/১৬৯৮।

www.al-itisam.com

হবে। তবুও আমরা মা আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত হাদীছটির আলোকে বলি, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি দেখতেন; তাহলে তিনি আজকের যুগের মহিলাদের মসজিদে ছালাত আদায়ের জন্য বের হতে নিষেধ করতেন। এখানে 'যদি দেখতেন' বলা হয়েছে। যেহেতু তিনি দেখেননি, সেহেতু নিষেধের হুকুম থেকে এটা বৈধতার হুকুমে চলে আসে।

দ্বিতীয়ত, তারা উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর হাদীছ দিয়ে বলেন যে, তিনি নাকি মহিলাদের মসজিদে ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে গমন করাকে নিষেধ করেছেন। অথচ এমন কোনো সুস্পষ্ট হাদীছ নেই, যেখানে তার পক্ষ থেকে এমন বক্তব্য পাওয়া যায়, বরং এই বক্তব্যের বিপরীতে তার অসংখ্য বক্তব্য বিদ্যমান। এমনকি এ সংক্রান্ত সবচেয়ে বেশি হাদীছ উমার ও তার পুত্র ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বিভিন্ন হাদীছের কিতাবে বিদ্যমান।

তৃতীয়ত, মসজিদ আল্লাহর ঘর। পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র ও নিরাপদ স্থান। যেখানে মহান আল্লাহর ইবাদতের জন্য সবাই উপস্থিত হয়। যদি নারী-পুরুষ সব জায়গায় নিজ প্রয়োজনে শরীআতের নির্দেশ মোতাবেক চলাফেরা করতে পারে, তাহলে মহান আল্লাহর ঘর ও পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম স্থান মসজিদে ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে যাওয়ায় এত যুক্তি-তর্ক পেশ ও নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে কেন?

চতুর্থত, তর্কের খাতিরে ধরেই নিলাম যে, মা আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর হাদীছে যেখানে বলা হয়েছে যে, যদি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজকের যুগের নারীদের দেখতেন, তাহলে তিনি মসজিদে গমন করতে নিষেধ করতেন। অথচ বর্ণনাকারী তথা মা আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর জীবনের আমল কী ছিল? তিনি তো সারাজীবন মসজিদে ছালাত আদায় করেছেন, যার দলীল প্রায় সকল হাদীছের কিতাবেই রয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ لَوْ رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

মা আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজকের দিনে নারীদের দেখতেন; তাহলে তাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন, যেভাবে বনূ ইসরাঈলের নারীদের নিষেধ করা হয়েছিল।[১১০]

এখানে মা আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা যে বক্তব্য পেশ করছেন সেটার কারণ হলো সেই সময়ে নারীরা সুগন্ধি, আতর ইত্যাদি বস্তু ব্যবহার করে মসজিদে যাওয়া শুরু করে। ফলত তিনি এভাবে বক্তব্য পেশ করেন।[১১১]

১১০. ছহীহ বুখারী, হা/৮৬৯; ইবনু খুযায়মা, হা/১৬৯৮।

মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার শর্তসমূহ:

উলামায়ে কেরাম মহিলাদের মসজিদে ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে যাওয়া বৈধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে তারা মসজিদে যাওয়ার জন্য কতিপয় শর্তারোপ করেছেন। সেই শর্তগুলো যথাযথভাবে পালন সাপেক্ষে তারা মসজিদে যেতে পারবে। যেমন—

১. আতর বা সুগন্ধি ব্যবহার করে যাবে না।

২. ফেনামুক্ত পথ হতে হবে।

৩. পোশাক-পরিচ্ছদ মার্জিত হতে হবে এবং এমন আর্কষণীয় পোশাক পরিধান করা যাবে না যাতে করে পুরুষ আকর্ষিত হয়।

৪. পুরুষের সংমিশ্রণ থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করতে হবে।

মহিলাদের ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদ উত্তম, নাকি বাড়ি উত্তম?

মহিলাদের ছালাত আদায়ের জন্য নিঃসন্দেহে মসজিদের চাইতে বাড়িই উত্তম স্থান। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ 'নারীদের সর্বোত্তম মসজিদ হলো তাদের ঘরের কুঠরি'।[১১২]

উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারীদের জন্য ছালাতের উত্তম স্থান তার নিজ ঘর। তবে মসজিদে ছালাত আদায় করার বিষয়টি জায়েয।

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা আমাদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করেছেন এবং তাঁর পরবর্তী যুগেও মহিলারা মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করেছেন, যা একাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এই বিষয়ে যে বা যারা যত ধরনের মিথ্যাচার, খোঁড়া যুক্তি উপস্থাপন করুক না কেন, তা ধর্তব্য নয়। বরং সুন্নাহ প্রমাণিত হওয়ার পর যার ইচ্ছা সে আমল করবে, আর যার ইচ্ছা সে করবে না। নিঃসন্দেহে কল্যাণ রয়েছে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্মপন্থায় ও তাঁর একনিষ্ঠ ছাহাবীদের অনুসরণে। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

১১১. মুসনাদে আহমাদ, ১/১৩৪১; ছহীহ বুখারী, হা/৮৬৯।

১১২. ইবনু খুযায়মা, হা/১৬৮৩; বায়হাক্বী, হা/৫৫৬৬।

www.al-itisam.com

হেলথ কর্নার

হাম: লক্ষণ, জটিলতা ও প্রতিরোধে করণীয়

-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ*

দেশে আবারও ভাইরাসজনিত রোগ হাম (Measles)-এর প্রাদুর্ভাব উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলার হাসপাতালে প্রতিদিন নতুন রোগী ভর্তি হচ্ছে, ফলে শিশুস্বাস্থ্য নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে বাড়ছে উৎকণ্ঠা। ২০২৬ সালের শুরু থেকেই আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঢাকার সংক্রামক রোগ হাসপাতালে মাত্র তিন মাসেই ২৫০-এর বেশি রোগী ভর্তি হয়েছে, যাদের বড় অংশই পাঁচ বছরের নিচের শিশু।

শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বব্যাপীও হাম একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা। প্রতি বছর প্রায় ৯০ লাখ মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয় এবং এক লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবার সীমাবদ্ধতার কারণে এর ঝুঁকি আরও বেশি। এমন পরিস্থিতিতে হাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা, এর লক্ষণ ও জটিলতা সম্পর্কে সচেতনতা এবং সময়মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী।

হামের ধরন:

হাম সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে।

সাধারণ হাম: জ্বর, কাশি, নাক দিয়ে পানি পড়া, চোখ লাল হওয়া এবং শরীরে ফুসকুড়ি দেখা যায়। অধিকাংশ রোগী সঠিক পরিচর্যায় সুস্থ হয়ে ওঠে।

জটিল হাম: দীর্ঘস্থায়ী জ্বর, তীব্র দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট ও অন্যান্য জটিলতা দেখা দিতে পারে। অপুষ্ট শিশুদের মধ্যে এ ধরনের ঝুঁকি বেশি।

অপ্রচলিত হাম: উচ্চমাত্রার জ্বর, অস্বাভাবিক র‍্যাশ ও শরীরে তীব্র অস্বস্তি এর বৈশিষ্ট্য।

লক্ষণ:

হামের লক্ষণ সাধারণত ধাপে ধাপে প্রকাশ পায়। প্রথমে উচ্চ জ্বর, শুকনো কাশি ও নাক দিয়ে পানি পড়া শুরু হয়। এরপর চোখ লাল হয়ে যায় এবং আলোতে অস্বস্তি দেখা দেয়। পরবর্তী পর্যায়ে মুখে লালচে ফুসকুড়ি দেখা দেয়, যা ধীরে ধীরে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

সম্ভাব্য জটিলতা:

হামকে সাধারণ রোগ মনে করে অবহেলা করা উচিত নয়। সময়মতো চিকিৎসা না নিলে বিভিন্ন জটিলতা দেখা দিতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে— নিউমোনিয়া বা ফুসফুসে সংক্রমণ, এনসেফালাইটিস বা মস্তিষ্কে প্রদাহ, ডায়রিয়া ও পানিশূন্যতা, অপুষ্টির মাত্রা বৃদ্ধি।

গবেষণায় দেখা গেছে, গুরুতর আক্রান্তদের একটি অংশ এসব জটিলতায় ভোগে এবং সময়মতো চিকিৎসা না পেলে তা প্রাণঘাতী হতে পারে।

শিশু সুরক্ষায় করণীয়:

হামে আক্রান্ত শিশুকে অন্তত ৮ থেকে ১০ দিন আইসোলেশনে রাখতে হবে। পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে নিয়মিত হাত ধোয়া, কাশি-হাঁচির শিষ্টাচার মেনে চলা এবং ব্যবহার্য জিনিসপত্র পরিষ্কার রাখা জরুরী। শিশুকে ফলমূল, শাকসবজি, প্রোটিনসমৃদ্ধ ও সহজপাচ্য খাবার দিতে হবে। পাশাপাশি পর্যাপ্ত পানি ও তরল খাবার গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে পানিশূন্যতা না হয়। পর্যাপ্ত বিশ্রামও রোগমুক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। চোখ পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে এবং ফুসকুড়িযুক্ত স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

কখন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন?

নিচের যেকোনো লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে— শ্বাসকষ্ট, খিঁচুনি, অতিরিক্ত দুর্বলতা, খেতে বা পান করতে না পারা, তীব্র ডায়রিয়া।

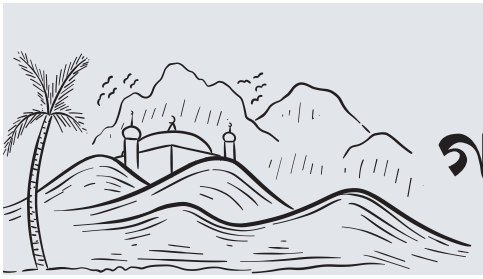
যেসব শিশু বেশি ঝুঁকিতে: পাঁচ বছরের নিচের শিশু, অপুষ্টিতে ভোগা শিশু, দুর্বল রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন শিশু।

উপসংহার:

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে হামের সংক্রমণ ও মৃত্যুর যে চিত্র দেখা যাচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। তবে সচেতনতা, দ্রুত রোগ শনাক্তকরণ, যথাযথ পরিচর্যা এবং সময়মতো চিকিৎসার মাধ্যমে এ রোগের ঝুঁকি অনেকাংশে কমানো সম্ভব। হামের লক্ষণ, জটিলতা ও প্রতিরোধ সম্পর্কে অভিভাবকদের সঠিক ধারণা থাকলে একটি শিশুর জীবন রক্ষা করা সহজ হবে। তাই আতঙ্ক নয়; প্রয়োজন সচেতনতা, সতর্কতা এবং সময়োপযোগী ব্যবস্থা।

১১৩. * চিকিৎসক, কলাম লেখক ও গবেষক; প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি।

www.al-itisam.com



গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান



ফিলিস্তীনের কান্না

-খাশিউর রহমান বিন মনছূর আলী*

ভোরের আযান তখনো শেষ হয়নি। হঠাৎ আকাশ কেঁপে উঠল বোমার বিকট শব্দে। মুহূর্তের মধ্যে চারদিক ধুলোয় মেঘে ঢেকে গেল। আকাশ-বাতাস অন্ধকার হয়ে এলো। বারুদের গন্ধে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। মানুষের আর্তনাদ, শিশুদের কান্না আর মায়েদের আহাজারি মিলে সৃষ্টি করল এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য।

ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে বসে আছে সাত বছরের ছোট্ট শিশু আহমাদ। তার চোখে আতঙ্ক, মুখে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার ছাপ। কিন্তু বুকের সঙ্গে শক্ত করে জড়িয়ে রেখেছে একটি ছেঁড়া স্কুলব্যাগ। সেই ব্যাগে নেই কোনো বই, নেই কোনো খাতা; আছে শুধু একটি ছোট্ট কুরআন মাজীদ। চারদিকে তাকিয়ে সে খুঁজছে তার মা কোথায়? তার ভাই-বোন কোথায়?

হঠাৎ ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে একটি ক্ষীণ শব্দ ভেসে এলো আল্লাহ... আল্লাহ... আল্লাহ...। আহমাদ ছুটে গেল। দেখল, তার ছোট বোন মারইয়াম ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে। শুধু একটি ছোট্ট হাত বাইরে বেরিয়ে আছে, যা অনবরত কাঁপছে।

আহমাদ তার ছোট্ট হাত দিয়ে ইট-পাথর সরাতে লাগল। চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। কাঁপা কণ্ঠে সে বলতে লাগল, মারইয়াম! ভয় পেয়ো না, বোন। আমি আছি তো। আমি তোমাকে একা ছেড়ে যাব না। তোমাকে নিয়ে যাব। তোমার কিছুই হবে না।

কিছু মানুষ ছুটে এলো সাহায্য করতে। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর মারইয়ামকে বের করে আনা গেল। কিন্তু সে তখনো অচেতন। আহমাদ বোনকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, মারইয়াম, ওঠো না! কথা বলো! তুমি কেন ঘুমিয়ে আছ? ওঠো, আমি তোমাকে স্কুলে নিয়ে যাব। ছুটি হলে দৌড়ে এসে তোমাকে নিয়ে আসব। ওঠো না, বোন... ওঠো...।

চারপাশে জড়ো হওয়া মানুষগুলো নিঃশব্দে দৃশ্যটি দেখছিল। তাদের চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল। কেউ আর নিজের কান্না আটকে রাখতে পারল না। অনেকেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। শহরে কোনো আলো নেই, আছে শুধু আগুনের লেলিহান শিখা আর ধ্বংসস্তূপ। ছোট্ট আহমাদ বোনকে কোলে নিয়ে বসে আছে। ঠিক তখনই একজন বিদেশি সাংবাদিক এগিয়ে এলেন। তিনি ক্যামেরা তাক করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী চাও?

আহমাদ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর চোখ মুছে ধীরে ধীরে বলল, আমি চাই, আমার মা যেন আর না কাঁদেন। আমার ছোট্ট বোনটা যেন আবার কথা বলতে পারে। আর আমার সহপাঠীরা যেন ভয়-আতঙ্ক ছাড়া স্বাভাবিক জীবন পায়।

একটু থেমে সে আবার বলল, আচ্ছা, আপনি ছবি তুলে কী করবেন? সাংবাদিক কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। আহমাদ বলল, আমি আর আমার বোন সকাল থেকে না খেয়ে বসে আছি। আমরা এক ফোঁটা পানিও পাইনি।

সাংবাদিক দ্রুত কিছু বিস্কুট ও পানি এগিয়ে দিলেন। ক্ষুধার্ত শিশুটি বিস্কুট খেতে খেতে বলল, সাংবাদিক স্যার, আমরা কি কোনো অপরাধ করেছিলাম? আমরা কি কারও কোনো ক্ষতি করেছিলাম? তাহলে কেন? কেন আমাদের মতো অসহায়, অবুঝ, নিষ্পাপ শিশুদের এই অমানবিক নির্যাতন, নিপীড়ন আর

১১৪. *দাওরায়ে হাদীছ ফারেগ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

www.al-itisam.com

গণহত্যার শিকার হতে হচ্ছে? এর কোনো উত্তর কি আপনার কাছে আছে? সাংবাদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন।

পৃথিবীর কোটি কোটি শিশু যেখানে খেলনা, সুস্বাদু খাবার কিংবা সুন্দর বাড়ির স্বপ্ন দেখে, সেখানে এই অবুঝ শিশুটি শুধু চাইল তার মা যেন না কাঁদেন, তার বোন যেন সুস্থ হয়ে কথা বলতে পারে আর তার সহপাঠীরা যেন আতঙ্কমুক্ত জীবন ফিরে পায়।

রাত গভীর হলো। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু আহত মানুষের গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। আহমাদ তখনো জেগে আছে। তার ছোট্ট হাতে ধরা কুরআন মাজীদ। বোনের মাথায় হাত রেখে সে ধীরে ধীরে সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করছে।

হঠাৎ এক বৃদ্ধ এসে তার মাথায় স্নেহের হাত রেখে বললেন, বাছা, ভয় পেয়ো না। আমাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের ঈমান কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। দুনিয়ার সব শক্তি সীমিত, কিন্তু আল্লাহর দয়া অসীম। তিনি অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন।

শিশুটির চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। সে দুই হাত তুলে দু'আ করতে লাগল, হে আল্লাহ! আমাদের হারানো ঘর ফিরিয়ে না দিলেও চলবে। তবে জান্নাতে আমাদের জন্য আরও সুন্দর ঘর তৈরি করে রাখুন। আর আমাদের একটু শান্তিতে বাঁচার সুযোগ দিন। আমাদের মা-বোনেরা যেন আর কখনো না কাঁদেন।

সেই দু'আ শুনে উপস্থিত সবাই ভেঙে পড়ল। কারও চোখ শুকনো রইল না। ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত এবং ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা সেই ছোট্ট শিশুটি সেদিন যেন সবার শিক্ষক হয়ে উঠল।

নৈতিক শিক্ষা:

১. প্রকৃত শক্তি অস্ত্রে নয়; ধৈর্য, সাহস ও ঈমানের মধ্যে নিহিত।

২. ভালোবাসা মানে প্রিয়জনের পাশে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিচল থাকা।

৩. মানবতা মানে অন্যের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করা, সহানুভূতি দেখানো এবং বিপদে পাশে দাঁড়ানো।

৪. অনেক সময় পৃথিবীর শক্তিধররা নীরব থাকলেও একটি নিষ্পাপ শিশুর অশ্রু মানবতার বিবেককে জাগিয়ে তুলতে পারে।

হে আল্লাহ! আমাদের হৃদয়কে কোমল করুন, যেন আমরা অবুঝ শিশুদের কান্না শুনে জেগে উঠতে পারি। আমাদের শিক্ষা দিন যে, নৈতিকতা শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা প্রকাশ পায় দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো, ক্ষুধার্ত শিশুর অশ্রু মুছে দেওয়া এবং অসহায় মানুষের কষ্ট লাঘব করার মধ্য দিয়ে। আল্লাহ আমাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল শাসককে সুমতি দিন- আমীন!



কবিতা

দুষ্ট লোকের জয়

-শামসুল আরেফীন
শিক্ষক, মারকাজুল কুরআন মাদরাসা, শ্রীপুর, গাজীপুর।

এই সমাজে বিচার-আচারটাকা দিয়ে হয়,
শক্তি কিংবা টাকা থাকলে
দুষ্ট লোকের জয়।
মূর্খ লোকে বিচারপতি
আইনকানুন নাই,
নির্বিচারে মরছে মানুষ
বিচার না যে পাই।
যিনি হবেন বিচারপতি
থাকবে আল্লাহর ভয়,
উভয় পক্ষে বিচার পাবে
জ্ঞানী লোকে কয়।
অসৎ লোকে বিচার করে
টাকা নিচ্ছে খুব,
কালো টাকায় হচ্ছে ধনী
দিচ্ছে লোভে ডুব।

যুবতিদের সাজ

-মো. আশরাফুল হক
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

মুসলিমদের এই দেশেতে
চলছে দেখ আজ,
অশালীন পোশাক পরে
যুবতিদের সাজ।
আলতা পায়ে টি-শার্ট গায়ে
চলছে দেখ দুলে,
মুচকি হেসে শয়তান বেশে
রাঙা খোঁপা ফুলে।
লজ্জা শরম ভুলে গিয়ে
পুরুষের বেশ ধরে,
তাদের সাজ দেখে যুবক
হোঁচট খেয়ে পড়ে।
কেমনে তবে এই সমাজে
বড় হবে শিশু,
অশালীনতায় ছড়িয়ে যাচ্ছে
প্রেমকে করে ইস্যু।

সেজদার শান্তি

-মুহাম্মাদ রিযওয়ানুল হক
বড় হাশিমপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

যখন কোলাহলে ভরে ওঠে চারিদিক,
চিন্তার ভারে নত হয় অন্তর-দিক্—
তখনই মিনার হতে ভেসে আসে ধ্বনি,
ডাকে বান্দাকে ফিরে পেতে আপন সত্বগুণী।
সেজদার মাটিতে লুটায়ে কপাল,
মুছে যায় হৃদয়ের অশান্ত জঞ্জাল।
যে শান্তি খোঁজে মানুষ দুনিয়ার পথে,
তা নেমে আসে নীরবে ছালাতের মাঝে।
ধনসম্পদ, পদমর্যাদা, খ্যাতির মান,
কোনোটিই দেয় না স্থায়ী সম্মান।
রবের সান্নিধ্যে নত হওয়ার মাঝে
আত্মা খুঁজে পায় মুক্তির সাজে।
খুশূ-খুযূ ভরা দুটি অশ্রুবিন্দু
ওজনদার হয় আমলের সিন্দুকে ইন্দু।
ছালাত যে কেবল ফরয বিধান নয়—
এ বান্দার মি'রাজ, রহমতের পরিচয়।
এসো তবে ফিরে যাই সেই পথধারে,
যেখানে সেজদা জ্বালে আলো আঁধারে।
দুনিয়ার সকল ক্লান্তি মুছে যায় তাহাতে—
যে হৃদয় নত হয় রবের ছালাতে।

শরৎ এলো

-শফিকুল ইসলাম
শিক্ষক, গোবিন্দাসী উচ্চ বিদ্যালয়, ভুয়াপুর, টাংগাইল।

শরৎ এলো সকাল বেলা
পাখির কলতানে,
রসে ভরা পাকা তালের
মিষ্টি মধুর ঘ্রাণে।
শরৎ এলো শিউলি ফুলে
ডালে ডালে হেসে,
নদীর তীরে শুভ্রাকাশে
মেঘের ভেলায় ভেসে।
শরৎ এলো বিলে-ঝিলে
শাপলা-শালুক ফুলে,
ঘাসের ডগায় শিশিরকণায়
খুকির কানের দুলে।

www.al-itisam.com

সংবাদ

বাংলাদেশ সংবাদ

চার খলীফার নামে বিএমএ-তে নতুন ব্যাটালিয়নের যাত্রা শুরু

বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি (বিএমএ)-তে 'দ্বিতীয় বাংলাদেশ ব্যাটালিয়ন' (2nd Bangladesh Battalion) নামে একটি নতুন প্রশিক্ষণ ব্যাটালিয়নের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন এবং অফিসার ক্যাডেটদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে উন্নত প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের লক্ষ্যেই এ ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে।

নবগঠিত ব্যাটালিয়নের চারটি কোম্পানির নাম রাখা হয়েছে ইসলামের চার খলীফার নামে। এগুলো হলো: আবু বকর কোম্পানি, উমর কোম্পানি, উসমান কোম্পানি ও আলী কোম্পানি। ইসলামী ইতিহাসের চার খলীফার বীরত্ব, ত্যাগ ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই এ নামকরণ করা হয়েছে।

এর আগে বিএমএ-র প্রথম ব্যাটালিয়নের কোম্পানিগুলোর নামকরণ করা হয়েছিল মহান মুক্তিযুদ্ধের বীরশ্রেষ্ঠদের নামে। সেনাবাহিনী সূত্র জানায়, আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অফিসার ক্যাডেটদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে নতুন এই ব্যাটালিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ভবিষ্যতে এ ব্যাটালিয়নের অধীনে হযরত ফাতেমা (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.)-এর নামে আরও দুটি নারী কোম্পানি যুক্ত করার পরিকল্পনাও রয়েছে।

নতুন এই ব্যাটালিয়নের যাত্রার মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যুক্ত হলো এক নতুন অধ্যায়।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধবিরতি: শান্তি প্রতিষ্ঠায় নতুন আশার আলো

সাম্প্রতিক সংঘাতের পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান একটি অন্তর্বর্তী সমঝোতা ও যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। কূটনৈতিক মধ্যস্থতায় হওয়া এ সমঝোতার ফলে উভয় দেশ সামরিক অভিযান স্থগিত রেখে বিরোধ কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করবে। এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হওয়ার আশা দেখা দিয়েছে।

আলোচনার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা শিথিল, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথে নিরাপদ জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করা। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মতে, এই যুদ্ধবিরতিকে স্থায়ী শান্তি চুক্তিতে রূপ দিতে পরবর্তীতে ধারাবাহিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

বিশ্লেষকদের মতে, সমঝোতা কার্যকর থাকলে মধ্যপ্রাচ্যে বড় ধরনের সংঘাতের ঝুঁকি কমতে পারে এবং বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারেও ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। তবে দীর্ঘদিনের অবিশ্বাস ও মতপার্থক্যের কারণে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা এখনো বড় চ্যালেঞ্জ। আন্তর্জাতিক মহল এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে উভয় দেশকে সংলাপ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছে।

মুসলিম বিশ্ব

যুদ্ধবিরতির পরও গাযায় ইসরাঈলি হামলায় নিহত সহস্রাধিক

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হলেও গাযা উপত্যকায় ইসরাঈলি সামরিক বাহিনীর হামলা অব্যাহত রয়েছে।

www.al-itisam.com

গাযার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ইসরাঈলি হামলায় অন্তত ১,০০৫ জন ফিলিস্তীনি নিহত এবং ৩,৩৮০ জনের বেশি আহত হয়েছেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা ও আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা এপি এ তথ্য জানিয়েছে।

গাযার সরকারি তথ্যকেন্দ্রের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুদ্ধবিরতির শর্ত উপেক্ষা করে ইসরাঈলি বাহিনী এ পর্যন্ত অন্তত ৩,৪৬৫ বার বিমান হামলা, কামানের গোলাবর্ষণ ও গুলি চালিয়েছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, স্থল সীমানা সম্প্রসারণের পাশাপাশি নির্দিষ্ট এলাকাকে লক্ষ্য করেও অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাঈলি বাহিনী, ফলে উপত্যকার মানবিক সংকট আরও গভীর হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া সংঘাতে গাযায় এ পর্যন্ত ৭৩ হাজারের বেশি ফিলিস্তীনি নিহত হয়েছেন, যাদের বড় অংশই নারী ও শিশু। আন্তর্জাতিক মহলের যুদ্ধবিরতির আহ্বান সত্ত্বেও সেখানে সহিংসতা থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

ভারতে ৪৫ দিনে ২৩টি মসজিদ-মাদরাসাসহ ধর্মীয় স্থাপনা উচ্ছেদ

ভারতে মাত্র ৪৫ দিনের মধ্যে অন্তত ২৩টি মসজিদ, মাদরাসা, ঈদগাহ ও দরগাহ উচ্ছেদ বা আংশিক ভেঙে ফেলার ঘটনায় আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। উচ্ছেদ অভিযানের বেশিরভাগই পরিচালিত হয়েছে দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান ও হরিয়ানার মতো বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোতে। ভেঙে ফেলা স্থাপনাগুলোর মধ্যে রয়েছে দিল্লির প্রায় ২০০ বছরের পুরোনো 'দরগাহ পঞ্চ পীরান', উত্তর প্রদেশের ১৮৫ বছরের প্রাচীন 'নূরী জামে মসজিদ' এবং গুজরাটের কচ্ছ জেলার 'জুনা কান্দলা মসজিদ'। কচ্ছে আগাম নোটিশ ছাড়াই আরও প্রায় ৩০টি স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এসব ঘটনার ফলে দেশটির মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগ ও ক্ষোভ বেড়েছে।

এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে মার্কিনভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা জাস্টিস ফর অল (Justice For All)। সংস্থাটির মতে, ঐতিহাসিক মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাগুলো মুসলিম সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত বৈষম্যের ইঙ্গিত বহন করে। একইভাবে, মার্কিন আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক কমিশন (USCIRF) এ প্রবণতাকে 'উদ্বেগজনক' বলে উল্লেখ করেছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরাও পর্যাপ্ত নোটিশ ও পুনর্বাসন ছাড়া এ ধরনের উচ্ছেদ অভিযান বন্ধের আহ্বান জানিয়ে একে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের পরিপন্থি বলে মন্তব্য করেছেন।

অন্যদিকে, স্থানীয় প্রশাসনের দাবি, কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে নয়, বরং সরকারি জমি থেকে অবৈধ দখল উচ্ছেদ এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেই এ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। তবে ভারতের বৃহত্তম মুসলিম সংগঠন জামিয়াত উলামায়ে হিন্দ এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড (AIMPLB) এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে অভিযোগ করেছে, যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই মুসলিমদের ধর্মীয় স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে। তারা এর প্রতিবাদে আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে এবং সুপ্রিম কোর্টে আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এআই ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দিল নরওয়ে

নরওয়ে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (প্রথম থেকে সপ্তম শ্রেণি; আনুমানিক ৬–১৩ বছর বয়সি শিক্ষার্থী) শ্রেণিকক্ষের পড়াশোনায় জেনারেটিভ এআই ব্যবহারে প্রায় সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। সরকারের মতে, এর উদ্দেশ্য শিশুদের মৌলিক শেখার দক্ষতা ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা রক্ষা করা।

সরকার জানিয়েছে, ছোট শিক্ষার্থীদের আগে পড়া, লেখা ও গণিতে শক্ত ভিত্তি গড়ে তোলা জরুরী। অতিরিক্ত এআই ব্যবহার তাদের নিজস্ব চিন্তা ও অনুশীলনের পরিবর্তে সরাসরি উত্তরনির্ভর করে তুলতে পারে। পাশাপাশি, এ বয়সের শিশুদের এআইয়ের দেওয়া তথ্য সমালোচনামূলকভাবে যাচাই করার সক্ষমতাও এখনও পুরোপুরি গড়ে ওঠে না।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষার্থীদের শেখার মান ও পরীক্ষার ফল নিয়ে উদ্বেগের কারণেও এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারের ধারণা, অতিরিক্ত ডিজিটাল নির্ভরতা এ সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

তবে নরওয়ে এআইকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেনি। ১৪–১৬ বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এআই ব্যবহার করতে পারবে এবং ১৭–১৯ বছর বয়সীদের উচ্চশিক্ষা ও কর্মজীবনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দায়িত্বশীলভাবে এআই ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

এর আগে নরওয়ে স্কুলে স্মার্টফোন ব্যবহারে কড়াকড়ি আরোপ এবং শ্রেণিকক্ষে কাগজের বইয়ের ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগও নিয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা মৌলিক শিক্ষায় আরও বেশি মনোযোগ দিতে পারে।

www.al-itisam.com

সওয়াল-জওয়াব

আক্বীদা

প্রশ্ন (১): রূহ (আত্মা) কী? এটি কি পদার্থ, শক্তি, নাকি সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো সৃষ্টি?

-আশিক ইকবাল
মাকলাহাট, নওগাঁ।

উত্তর: রূহ (الروح) আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট একটি বাস্তব সত্তা, যা হলো সূক্ষ্ম নূর। এটিকে শক্তি বা আমাদের পরিচিত পদার্থ বলার পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর নির্ভরযোগ্য দলীল নেই। বরং এটি গায়েবী জগতের এমন এক সৃষ্টি, যার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ পূর্ণ জ্ঞান রাখে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, রূহ আমার রবের আদেশসংক্রান্ত বিষয়। আর তোমাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে খুবই সামান্য' *(আল-ইসরা, ১৭/৮৫)*। তবে কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমে রূহ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা হচ্ছে, রূহ দেহে প্রবেশ করে এবং দেহ থেকে বের হয় *(ছহীহ বুখারী, হা/৩২০৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৪৩)*। ঘুমের সময় রূহ আংশিকভাবে কবয করা হয় *(আয-যুমার, ৩৯/৪২)*। মৃত্যুর সময় রূহ সম্পূর্ণভাবে কবয করা হয় *(আস-সাজদা, ৩২/১১)*। ফেরেশতারা রূহ গ্রহণ করেন ও নিয়ে যান *(আন-নাহল, ১৬/৩২; আবূ দাঊদ, হা/৪৭৫৩)*।

প্রশ্ন (২): আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্মের ৫০ হাজার বছর পূর্বে তার ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। অতঃপর তার মায়ের পেটে যখন চার মাস হয়, তখন তার ভাগ্য কি পুনরায় লিপিবদ্ধ করা হয়?

-ইমরান
আমনুরা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: আল্লাহ তাআলা মানুষের তাকদীর (ভাগ্য) সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করার ৫০ হাজার বছর পূর্বেই লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করেছেন *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৫৩)*। এরপর ভ্রূণের বয়স ১২০ দিন (চার মাস) হলে ফেরেশতাকে পাঠিয়ে তার তাকদীর পুনরায় লিখানো হয় *(ছহীহ বুখারী, হা/৩২০৮, ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৪৩)*। তবে ভ্রূণ অবস্থায় যে তাকদীর লেখা হয়, তা লাওহে মাহফূযে পূর্বলিখিত তাকদীরেরই অনুলিপি; নতুন কিছু নির্ধারণ করা হয় না *(শারহু ছহীহ মুসলিম, খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ১৯০-১৯১)*। মূলত লাওহে মাহফূযের জ্ঞান আল্লাহর কাছে রয়েছে। এ ব্যাপারে ফেরেশতাদের জ্ঞান না থাকায় ভ্রূণের ১২০ দিন হলে তার তাকদীর লেখা হয় অর্থাৎ ওইদিন সেই ভ্রূণের সাথে দায়িত্বশীল ফেরেশতারা তার তাকদীরের মৌলিক কিছু বিষয় জানতে পারে, যেমন- তার রিযিক, আয়ু।

প্রশ্ন (৩): পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ধর্ম হিন্দু ধর্ম। একথা কি ঠিক? হিন্দু ধর্মের সাথে পূর্বের কোনো নবী রাসূলের সম্পৃক্ততা আছে কি, যেমনটা ইয়াহূদী ও নাছারার সাথে আছে?

-ইসহাক
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: সকল নবী-রাসূল হিন্দু ধর্ম তথা মূর্তিপূজা বা শিরকের বিরুদ্ধে দাওয়াত দিয়েছেন। পৃথিবীর প্রাচীন এবং একমাত্র আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত ধর্ম হলো ইসলাম (আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের ধর্ম), যা আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষ আদম (আলাইহিস সালাম) -এর মাধ্যমে শুরু করে সকল নবী-রাসূল (আলাইহিমুস সালাম) -এর উপর অবতীর্ণ করেছেন *(আলে ইমরান, ৩/১৯; আন-নাহল, ১৬/৩৬)*। যে ইসলামের উপর আদম ও নূহ (আলাইহিমাস সালাম) -এর মধ্যবর্তী দশ প্রজন্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল *(তাফসীর আত-তাবারী, সূরা আল-বাকারা, ২/২১৩, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৭৫–২৭৬; আল-মুসতাদরাক, হা/৪০৫৭)*। সুতরাং 'পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ধর্ম হিন্দু ধর্ম' কথাটি বিভ্রান্তিমূলক মিথ্যা কথা। পূর্বের কোনো নবী-রাসূলের হিন্দু ধর্মের সাথে সম্পৃক্ততা ছিল না। বরং সকল নবী-রাসূলের ধর্ম ছিল এক, তা হচ্ছে ইসলাম *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৪৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৬৫)*।

প্রশ্ন (৪): আমাদের এখান থেকে প্রায় ৮০/১০০ কিলোমিটার দূরে সন্তিপুরে একটি মসজিদ আছে, যেটি রাতারাতি মাটি থেকে উঠে এসেছিল- এমন কথা প্রচলিত আছে। অনেকে সেখানে মানত করে, সুস্থ হলে মুরগি বা ছাগল দেব। এমন কাজ করা যাবে কি?

-মোহাম্মদ সিয়াম
কুষ্টিয়া সদর।

www.al-itisam.com

উত্তর: কোনো মসজিদকে কেন্দ্র করে এই বিশ্বাস রাখা যে, সেটি অলৌকিকভাবে রাতারাতি মাটি থেকে উঠে এসেছে অথবা সেখানে মানত করলে রোগমুক্তি, সন্তান লাভ, বিপদ দূর হওয়া ইত্যাদি বিশেষ বরকত পাওয়া যায়, এগুলো কুসংস্কার ও শিরক। মানত আল্লাহ তাআলার ইবাদত *(আল-হজ্জ, ২২/২৯)*। মানত কেবল আল্লাহর জন্যই হতে হবে *(ছহীহ বুখারী, হা/৬৬৯৬)*। সুতরাং অসুস্থতা থেকে আরোগ্য চাইতে হলে সরাসরি আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। কোনো মাসজিদ, কবর বা বিশেষ স্থানের সাথে মানতকে জড়িয়ে দেওয়া এবং সেখান থেকে বিশেষ বরকত প্রত্যাশা করা শিরক। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য; সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করো না' *(আল-জিন, ৭২/১৮)*।

প্রশ্ন (৫): আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সর্বশক্তিমান। তিনি 'হও' বললেই সবকিছু হয়ে যায়। তাহলে কুরআনে আসমান-যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করার কথা এসেছে কেন? এর পেছনে আল্লাহর হিকমত কী?

-মামুনুর রশিদ
জামালপুর।

উত্তর: প্রথমত, কুরআন মাজীদে যেমনিভাবে এই কথা এসেছে যে, আল্লাহ তাআলা 'হও' বললেই হয়ে যায় *(ইয়া-সীন, ৩৬/৮২)*, তেমনিভাবে এই কথাও এসেছে যে, তিনি আসমান এবং যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন *(হূদ, ১১/০৭)*। সুতরাং আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে যা বলেছেন তার প্রতি আমাদের অবশ্যই মজবুত ঈমান রাখতে হবে, এক্ষেত্রে আল্লাহর হিকমত আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক। দ্বিতীয়ত, মুফাসসিরগণ উক্ত বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একাধিক হিকমত উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য হিকমত হলো- ১. তাড়াহুড়া না করে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করে কর্ম সম্পাদন করার সবক শেখানো। মানুষ যেন এটা শেখে যে, আসমান এবং যমীন সৃষ্টি করতে যেখানে আল্লাহ তাআলার শুধু 'হও' বলাটাই যথেষ্ট ছিল, সেখানে তিনি তা সৃষ্টি করলেন ছয় দিনে। তাহলে মানুষের জন্য কর্ম সম্পাদন করার ক্ষেত্রে কী পরিমাণ পরিকল্পনা ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা উচিত! *(তাফসীরে কুরতুবী, ৭/২১৯)*। ২. সূরা হূদের ৭ নম্বর আয়াতে ছয় দিনে আসমান এবং যমীন সৃষ্টি করার বিষয়টি উল্লেখ করার পর আল্লাহ তাআলা এর হিকমত সম্পর্কে বলেন, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا অর্থাৎ তিনি ছয় দিনে আসমান এবং যমীন সৃষ্টি করেছেন এটা পরীক্ষা করার জন্য যে, মানুষের মধ্যে কার আমল সবচেয়ে সুন্দর। সুতরাং এখানে দ্রুত আমল করা বা বেশি সংখ্যক আমল করা বিবেচ্য নয়; বরং সুন্দর আমল বিবেচ্য। আর সুন্দরভাবে আমল করতে গেলে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করতে হয় *(তাফসীরে তাবারী, ১৫/২৫১)*।

প্রশ্ন (৬): বিয়ে ও রিযিক কি লাওহে মাহফূযে লেখা আছে?

-হাসান
ঢাকা।

উত্তর: হ্যাঁ, বিবাহ ও রিযিক লাওহে মাহফূযে লিখিত আছে। আল্লাহ তাআলা যেদিন কলম সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মাখলূক্ব সৃষ্টি হবে, তার সবই লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহ তাআলা কলম সৃষ্টি করে বললেন, লেখো'। কলম বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি কী লিখব? আল্লাহ তাআলা বললেন, 'কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সবই লিখো'। সে সময় কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হবে, কলম সব কিছুই লিখে ফেলল *(মুসনাদে আহমাদ, হা/২২৭৫৭)*। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, 'ভ্রূণ মাতৃগর্ভে চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। ফেরেশতা তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেন এবং লিখে দেন তার রিযিক, বয়স, আমল ও তিনি সৌভাগ্যবান নাকি দুর্ভাগা' *(ছহীহ বুখারী, হা/৭৪৫৪; ইবনু মাজাহ, হা/৭৬)*। আর রিযিক যেভাবে লিপিবদ্ধ আছে, বিবাহও সেভাবে নির্ধারিত আছে। এই পৃথিবীতে কে কার স্বামী বা স্ত্রী হবে, তাও নির্দিষ্ট রয়েছে। কেননা আসমান-যমীনের কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয়।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৭): কেউ সকালে মাসিক থেকে পবিত্র হয়েছে। সারাদিন ঠিকঠাক মতোই ছালাত পড়েছে। কিন্তু রাতের বেলায় এসে দেখে তার হলুদ হলুদ মাসিক দেখা যাচ্ছে, খুব হালকা রং। এমতাবস্থায় তার কী করা উচিত? সে কি আবার গোসল করবে, নাকি ছালাত চালিয়ে যাবে?

-আসমা
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর: যদি নিশ্চিত পবিত্রতার পর হলুদ স্রাব আসে, তাহলে এটি মাসিক বলে গণ্য হবে না। তিনি ছালাত চালিয়ে যাবেন, নতুন করে গোসল করতে হবে না। উম্মু আতিয়্যাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, পবিত্রতার পর আমরা হলুদ ও মেটে রংয়ের স্রাবকে কোনো গুরুত্ব দিতাম না অর্থাৎ হায়েয গণ্য করতাম না *(আবূ দাঊদ, হা/৩০৭)*। অতএব, পবিত্রতার পর দেখা হলুদ স্রাব মাসিক নয়; এটি ওযূ ভঙ্গকারী অন্যান্য স্রাবের মতো। ছালাতের সময় ওযূ করে নিলেই যথেষ্ট।

www.al-itisam.com

ছালাত

প্রশ্ন (৮): ছালাতে সূরা ফাতেহা বা অন্য সূরা পড়ার সময় আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম ও বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পুরোটাই বলতে হয় নাকি শুধু বিসমিল্লাহ বলতে হয়?

-সাজ্জাদ রহমান
মাগুরা।

উত্তর: ছালাতে সূরা ফাতেহা পড়ার পূর্বে 'আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম ও বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' পুরোটাই পড়া সুন্নাত এবং অন্য সূরা পড়ার পূর্বে পূর্ণ বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়া সুন্নাত *(আবূ দাঊদ, হা/৭৭৫, ৭৮৮)*।

প্রশ্ন (৯): ঈদের খুৎবা শোনা কি ওয়াজিব? নাকি ছালাত শেষে কেউ চাইলে চলে আসতে পারে?

-মো. শিমুল
ঢাকা।

উত্তর: ছালাতের পর চলে যাওয়া জায়েয হলেও ভদ্রভাবে বসে থেকে গুরুত্ব সহকারে খুৎবা শোনা উচিত। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আযহা'র দিন ঈদের মাঠে যেতেন এবং সেখানে তিনি প্রথম যে কাজ শুরু করতেন তা হলো ছালাত। আর ছালাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং তারা তাদের কাতারে বসে থাকত। তিনি তাদের নছীহত করতেন, উপদেশ দিতেন এবং নির্দেশ দান করতেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৬)*। এছাড়া রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের কাছে খুৎবা দিয়ে মহিলাদের কাছে গিয়ে খুৎবা দিতেন। এতক্ষণ তারা সেখানেই অবস্থান করত *(ছহীহ বুখারী, হা/১৪৪৯)*।

প্রশ্ন (১০): আমাদের মসজিদের সামনে দেয়াল থেকে ১/২ হাত দূরে কবর আছে। মসজিদ আগে হয়েছে, কবর পরে হয়েছে। মাঝখানে সামান্য ফাঁকা জায়গা আছে। অন্য মসজিদ দূরে। এ অবস্থায় এই মসজিদে ছালাত আদায় করা কি জায়েয? না হলে করণীয় কী?

-মো. রাহুল ইসলাম
নীলফামারী।

উত্তর: কবরের উপরে, কবরকে সামনে রেখে কিংবা কবরকে পাশে রেখে ছালাত আদায় করা যাবে না। আবূ মারসাদ আল-গানাবী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা কখনো কবরের উপর বসবে না এবং কবরের দিকে মুখ করে ছালাতও আদায় করবে না' *(ছহীহ মুসলিম, হা/২১৪০)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে চুনা লাগাতে, তাতে লিখতে, তার উপর ঘর নির্মাণ করতে এবং তা পদদলিত করতে নিষেধ করেছেন *(তিরমিযী, হা/১০৫২)*। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের মাঝে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন *(বাযযার, হা/৭৩৪০)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীদের ও সৎলোকদের কবরগুলোকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। অতএব, সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করো না। কেননা আমি তোমাদের এ থেকে নিষেধ করছি' *(ছহীহ মুসলিম, হা/৫৩২)*। তবে কবর ও মসজিদের মাঝে যদি দেয়াল থাকে, যা কবর থেকে মসজিদকে পৃথক করছে সে ক্ষেত্রে ছালাত বৈধ হবে *(মাজমূউ ফাতাওয়া, ১২/৩১)*। আর যদি তা না থাকে, তবে অতিসত্বর মসজিদ ও কবরস্থানকে পৃথককারী আলাদা প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে *(আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ, পৃ. ১২৭; শায়খ বিন বায, মাজমূউ ফাতাওয়া, ১৩/৩৫৭)*।

প্রশ্ন (১১): ছালাতে শুধু একদিকে সালাম ফিরিয়ে ছালাত শেষ করা যাবে কি?

-মকবুল হোসেন
পাবনা।

উত্তর: দুই দিকে সালাম ফিরানোই রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিক প্রচলিত সুন্নাহ এবং এটিই উত্তম *(ছহীহ মুসলিম, হা/৫৮২; মাজমূউ ফাতাওয়া, ২২/২৫৯-২৬১)*। তবে ছালাতে শুধু একদিকে সালাম ফিরিয়ে ছালাত শেষ করা জায়েয *(আবূ দাঊদ, হা/১৩৪৭; তিরমিযী, হা/২৯৬; ইবনু মাজাহ, হা/৯১৯)*।

প্রশ্ন (১২): নারীরা গর্ভকালীন সময়ে বসে বসে ইশারায় ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-মাসুদ রানা
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

উত্তর: গর্ভবতী নারী যদি দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয়, কিন্তু যথানিয়মে রুকূ-সিজদা করতে সক্ষম না হয়; তাহলে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে এবং রুকূ-সিজদার জন্য দাঁড়ানো অবস্থায় ইশারা করবে। আর যদি দাঁড়িয়ে থাকতে এবং রুকূ-সিজদা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে বসে ছালাত আদায় করবে এবং রুকূ-সিজদার জন্য ইশারা করবে *(ছহীহ বুখারী, হা/১১১৭; মুওয়াত্ত্বা মালিক, হা/৪৬৪)*।

প্রশ্ন (১৩): ছালাতের মুকাব্বির মুছল্লী না হলে, তার ইক্তিদা করলে ছালাত হবে কি?

-শাহিদুল ইসলাম
কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর: মুকাব্বির ইক্তিদা করবে ইমামের আর মুছল্লী ইক্তিদা করবে মুকাব্বিরের। মুকাব্বির মূলত ইমামের আওয়াজকে পৌঁছিয়ে দেয়। আর মুকাব্বির হতে হবে মুছল্লীদের মধ্য থেকে। জামাআতের ছালাতে শরীক হয়নি এমন ব্যক্তি মুকাব্বির হতে পারবে না *(ছহীহ মুসলিম, হা/৪১৩)*।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (১৪): জামাআতে ফরয ছালাত আদায়কালে যদি মুছল্লীর কোনো ভুল হয়, তাহলে তার করণীয় কী? যেমন- ইমাম রুকূতে গেছে আর মুছল্লী ভুল করে সিজদায় গেছে।

-বাদিউল ইসলাম
কুষ্টিয়া।

উত্তর: ইমাম যদি রুকূতে যায় এবং মুছল্লী ভুল করে সিজদায় চলে যায়, তাহলে মুছল্লীর করণীয় হলো দ্রুত রুকূতে ফিরে আসা এবং ইমামের সাথে রুকূ সম্পন্ন করা *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৮)*। এমতাবস্থায় মুক্তাদীর ভুল হলে তা ভুল বলে গণ্য হয় না।

ছিয়াম

প্রশ্ন (১৫): ইচ্ছাকৃতভাবে নফল ছিয়াম, যেমন- আশূরার ছিয়াম ভঙ্গ করলে কি গুনাহ হবে, নাকি কাযা ও কাফফারাও ওয়াজিব হবে?

-খাঁন ইলিয়াস
ফরিদপুর।

উত্তর: ইচ্ছাকৃতভাবে নফল ছিয়াম, যেমন- আশূরা, আরাফা, সোমবার-বৃহস্পতিবারের ছিয়াম ইত্যাদি ভঙ্গ করলে কাযা ও কাফফারা কোনোটিই ওয়াজিব নয়। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এসে বলতেন, ‘তোমাদের কাছে কোনো খাবার আছে কি?’ আমরা না বললে তিনি বলতেন, ‘আমি ছিয়াম রাখলাম’। একদিন তিনি আমাদের কাছে আগমন করলে আমরা বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে কিছু হাইস (উত্তম খাবার) হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। আমরা তা আপনার জন্য রেখে দিয়েছি। তিনি বললেন, ‘আমাকে তা দেখাও; অবশ্য আমি সকালে ছিয়ামের নিয়্যত করেছি। পরে তা খেয়ে ছিয়াম ছেড়ে দিলেন *(ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৪)*। বরং নফল ছিয়াম পালনকারী তার ছিয়াম এর ব্যাপারে স্বাধীন; ইচ্ছা করলে ছিয়াম পূর্ণ করবে, ইচ্ছা করলে ভঙ্গ করবে *(তিরমিযী, হা/৭৩২, নাসাঈ, হা/৩৮২২)*।

যাকাত ও দান-ছাদাকা

প্রশ্ন (১৬): আমি একজন এমপিওভুক্ত গণিত শিক্ষক, মাসে গড়ে প্রায় ৪০,০০০ টাকা আয় করি। ছয় মাস আগে বিয়ে করেছি। স্ত্রীর কাছে ৩ ভরি এবং আমার দেওয়া ১ ভরিসহ মোট ৪ ভরি স্বর্ণ আছে। আমার কোনো সঞ্চয় বা জমিজমা নেই, শুধু গ্রামে একটি বাড়ি আছে, যেখানে বাবা-মা থাকেন। বিয়ের সময় নেওয়া ৫ লক্ষ টাকার ব্যাংক ঋণ এখনও আছে। এই অবস্থায় কি আমার উপর যাকাত ফরয হবে?

-মো. আলী হায়দার
ময়মনসিংহ।

উত্তর: প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী আপনার উপর যাকাত ফরয নয়। কেননা সম্পদ নিসাব পরিমাণ হয়নি। আপনার স্ত্রীর ৪ ভরি স্বর্ণ তারই মালিকানাধীন। এটা আপনার উপর যাকাত ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচ্য নয় *(আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৩)*।

প্রশ্ন (১৭): যে টাকা মানুষকে দান করার নিয়্যতে রাখা হয়, সেটা দান না করে তা দিয়ে ইসলামী বই কিনে পড়া যাবে কি?

-সাদ
পূর্ব শাহী ঈদগাহ, সিলেট।

উত্তর: দান করার নিয়্যতে টাকা রাখলে তা দানই করতে হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘নিশ্চয় আমলের ফলাফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল’ *(ছহীহ বুখারী, হা/১)*। কেননা ভালো কাজের নিয়্যত করা মাত্রই এক নেকী অর্জিত হয়। আর তা বাস্তবায়ন করলে নূন্যতম দশ নেকী অর্জিত হয় এবং ব্যক্তির ইখলাছ ও সুন্দরভাবে আমল করার ভিত্তিতে উক্ত নেকী সাতশত বা তার চেয়েও অধিক গুণ বৃদ্ধি করা হয় *(ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৯১; ফাতহুল বারী, ১১/৩২৬)*। তাই দান করার নিয়্যতে রাখা টাকা দিয়ে বই না কিনে দানই করবে। তবে জরুরী কারণে নিয়্যত পরিবর্তন করতে পারে।

জায়েয-নাজায়েয

প্রশ্ন (১৮): ফুটবল বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে কোনো দলকে সাপোর্ট করা, বিভিন্ন দলের পতাকা বাড়ির ছাদে লাগানো, তাদের জার্সি গায়ে পরা, তাদের খেলা সম্পর্কে মিছিল-মিটিং করা যাবে কি?

-মোস্তফা মনোয়ার
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তর: বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজন শয়তানের পরিকল্পিত চক্রান্তের অন্যতম অংশ। গোপনে পাপ করিয়ে অভ্যস্ত করার পর শয়তান চক্রান্ত করে কীভাবে বিশ্বপরিসরে পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষকে একসঙ্গে পাপ করানো যায়। তখন সে তারই অনুসারী পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মোড়লদের মস্তিষ্কে বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনের পরিকল্পনা ঢুকিয়ে দেয়। এই মোড়লরা নৈতিকতা, ধর্মীয় অনুশাসন, সামাজিক রক্ষণশীলতা ইত্যাদির তোয়াক্কা না করে গরীবদের পকেট থেকে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ বাগিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে শয়তানের উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। আবার এদের সঙ্গে যোগ দেয় স্বার্থবাদী ও ভণ্ড রাজনীতিবিদরা। কারণ জনগণকে বিশ্বকাপ ফুটবলের উন্মাদনায় মত্ত রাখতে পারলে তারা রাজনৈতিক বহু ফায়দা লুটে নিতে সক্ষম হবে। বর্তমানে হচ্ছেও তাই। মানুষ এতটাই মত্ত হয়েছে যে, পুরো দেশ রসাতলে গেলেও কোনো পরোয়া নেই। এছাড়াও বিশ্বকাপ

www.al-itisam.com

ফুটবল আয়োজনে রয়েছে নানা ধরনের ঈমানবিধ্বংসী কর্মকাণ্ড। উল্লেখযোগ্য কিছু কর্মকাণ্ড নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. ফুটবল বিশ্বকাপ মূলত মানুষকে পশুতে রূপান্তরিত করে। কেননা ফুটবল বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে অনেক মানুষ এমন উন্মত্ত, বিবেকহীন, চিৎকার-চেঁচামেচি ও নিয়ন্ত্রণহীন আচরণ করে, যা কুরআনের ভাষায় চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তার চাইতেও নিকৃষ্ট *(আল-ফুরকান, ২৫/৪৩-৪৪)*।

২. ফুটবল বিশ্বকাপ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জুয়ার আসর। এটি বিশ্বব্যাপী জুয়া, বেটিং (কোনো খেলা, ঘটনা বা ফলাফল সম্পর্কে পূর্বানুমান করে অর্থ বা মূল্যবান কিছু বাজি রাখা) ও হারাম অর্থ লেনদেনের অন্যতম বৃহৎ উপলক্ষ, যা কুরআনে আল্লাহ তাআলা শয়তানের অপবিত্র কাজ ও হারাম বলে ঘোষণা করেছেন *(আল-মায়েদা, ৫/৯০-৯১)*।

৩. ফুটবল বিশ্বকাপে বিজাতীয় সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ হয়, যা একজন মুসলিমকে সাংস্কৃতিকভাবে ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানে রূপান্তরিত করে। বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে মুসলিমরা অমুসলিমদের ধর্মীয় বা তাদের স্বাতন্ত্র্যসূচক সংস্কৃতি (প্রতীক, পতাকা, জার্সি, স্লোগান ও জীবনধারা) অন্ধভাবে অনুকরণ করে, তাদের প্রতি নিষিদ্ধ পর্যায়ের ভালোবাসা পোষণ করে। যে ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের রীতি-নীতি বিঘত-বিঘত ও হাত-হাত অনুসরণ করবে...' ছাহাবীগণ বললেন, ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের? তিনি বললেন, 'তাহলে আর কারা?' *(ছহীহ বুখারী, হা/৭৩২০; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৬৯)*। আর যারা তাদের প্রতি নিষিদ্ধ পর্যায়ের ভালোবাসা পোষণ ও তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত *(আল-মায়েদা, ৫/৫১; আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১)*।

৪. ফুটবল বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে গান, বাদ্যযন্ত্র ও হারাম বিনোদনের আয়োজন করা হয়, যা হারাম। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক হবে, যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে' *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৯০)*।

৫. ফুটবল বিশ্বকাপে দলীয় সমর্থনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া, গালি, মারামারি ও সম্পর্ক নষ্ট করার মাধ্যমে বিভক্তি ও শত্রুতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ো না; তাহলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে' *(আল-আনফাল, ৮/৪৬)*।

৬. ফুটবল বিশ্বকাপে দলীয় পক্ষপাত, অনর্থক সময় ও অর্থের অপচয় করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই' *(আল-ইসরা, ১৭/২৭)*। বিশ্বকাপ ফুটবল একজন মুসলিমকে ইসলামী সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত করে দেয়। সুতরাং একজন মুসলিমের জন্য ফুটবল বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে কোনো দলকে সাপোর্ট করা, বিভিন্ন দলের পতাকা বাড়ির ছাদে লাগানো, তাদের জার্সি পরিধান করা, তাদের খেলা সম্পর্কে মিছিল-মিটিং করাসহ ফুটবল বিশ্বকাপ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় হারাম *(মাজমূউ ফাতাওয়া, ২০/১৬৪)*। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন।

প্রশ্ন (১৯): আমার সামনের দুটি দাঁতের মাঝখানে কিছুটা ফাঁকা আছে। এই ফাঁকাটি আমার জন্মগত না, কাঠি দিয়ে খোঁচানোর কারণে ফাঁকা হয়ে গেছে, এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে মাঝখানের ফাঁকাটি বন্ধ করার জন্য কোনো চিকিৎসা নেওয়া যাবে কি? এবং সামনে দুটি দাঁত সামান্য লম্বা তা কেটে সমান করা যাবে কি? নাকি এটি সৃষ্টির পরিবর্তন হবে।?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: প্রশ্নে উল্লেখিত উক্ত ফাঁকাটি বন্ধ করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য চিকিৎসা নেওয়া যায়, যদি তা সৃষ্টির পরিবর্তন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য না হয় *(শারহু ছহীহ মুসলিম, ১৪/১০৭)*। অস্বাভাবিক যেকোনো ত্রুটি দূর করার জন্য দাঁতের চিকিৎসা করা যায়। তবে সৌন্দর্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে লম্বা দাঁত কেটে সমান করা সৃষ্টির পরিবর্তন, যা হারাম। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর অভিশাপ সেই নারীদের উপর যারা উল্কি আঁকে, আঁকিয়ে নেয় এবং যারা ভ্রু উপড়ে ফেলে বা পাতলা করে আর সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে। আর যারা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে *(ছহীহ বুখারী, হা/৪৮৮৬ ও ৫৯৩১; ছহীহ মুসলিম, হা/২১২৫)*।

প্রশ্ন (২০): একজন ব্যক্তি নিজ টাকায় মসজিদ নির্মাণ করে ওয়াকফ করেছেন। বর্তমানে নিচতলা মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তিনি এখন মসজিদের উপরের কয়েকটি তলা অর্থের বিনিময়ে নিয়ে সেখানে আবাসিক ফ্ল্যাট করতে চান, আর সেই অর্থ মসজিদের কাজে ব্যয় হবে। এটা করা যাবে কি?

-আব্দুল কাদির
ঢাকা।

উত্তর: যদি তিনি জমিসহ পুরো ভবনকে মসজিদ হিসেবে ওয়াকফ করে দেন, তাহলে পরবর্তীতে তিনি উপরের তলাগুলো অর্থের বিনিময়ে নিজস্ব আবাসিক ফ্ল্যাট বানাতে পারবেন না। কারণ ওয়াকফ সম্পত্তি আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ওয়াকফ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন, 'তুমি চাইলে মূল সম্পত্তি (ওয়াকফ হিসেবে) আটকে রাখো এবং এর ফল দান করো। তা বিক্রি করা যাবে না, হিবা করা যাবে না এবং উত্তরাধিকারসূত্রে বণ্টন করা যাবে না' *(ছহীহ বুখারী, হা/২৭৩৭;*

www.al-itisam.com

ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩২)। কোনো বস্তু ওয়াকফ করা হলে তা ওয়াকফকারীর মালিকানা থেকে বের হয়ে যায় *(আল-মুগনী, ৬/১৮৫)*। তবে মসজিদের উন্নয়নের জন্য উপর তলা বা নিচ তলায় হোক একাধিক ফ্ল্যাট তৈরি করে ভাড়া দেওয়া যায়।

প্রশ্ন (২১): বাইরে বের হলে স্বামী হাত-পা মোজা পরতে বলে, কিন্তু গরমের কারণে স্ত্রী না পরলে কোনো পাপ হবে কি?

-সাকিবুল হাসান
ঢাকা।

উত্তর: কব্জি পর্যন্ত হাত ও মুখমণ্ডল খোলা জায়েয হলেও তাক্বওয়ার দাবি এটাই যে হাত-পায়ে মোজা পরে এবং মুখমণ্ডল ঢেকে বের হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা ইফকের ঘটনায় বলেন, তিনি (ছাফওয়ান) আমাকে চিনতে পেরে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়লে আমি তা শুনতে পেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে আমার চেহারা ঢেকে ফেললাম *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৮৩৫)*। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হজ্জের ব্যাপারে বলেন, আমাদের সামনে কোনো পুরুষ এলে আমরা মুখের উপর কাপড় ঝুলিয়ে দিতাম। যখন আমরা ওদের সামনে চলে যেতাম, তখন মুখমণ্ডল খুলে রাখতাম *(আবূ দাঊদ, হা/১৫৬২)*। এজন্য স্বামীর নির্দেশ মান্য করে মোজা পরেই বাহিরে বের হওয়া উচিত।

প্রশ্ন (২২): বাসে জার্নির সময় দেখা যায় অনেকে কাউন্টার থেকে সামনে গিয়ে গাড়ির স্টাফদের সাথে ডিল করে ৬০০ টাকার আসল ভাড়া ৪০০ টাকা দিয়ে ভ্রমণ করে। আমিও যদি এভাবে জার্নি করি তাহলে কি পাপ হবে?

-ফাতেমা তুজ জহুরা
নওগাঁ।

উত্তর: কোম্পানির অনুমোদিত ছাড় না হয়ে থাকলে ৬০০ টাকার সিট ৪০০ টাকায় স্টাফের সাথে গোপন সমঝোতা করে ভ্রমণ করা বৈধ নয়, এতে প্রতারণা ও আমানতের খিয়ানতে সহযোগিতা করা হয় *(আল-মায়েদা, ৫/২; ছহীহ মুসলিম, হা/১০১)*। স্টাফ গোপনে টাকা নিয়ে কোম্পানির ক্ষতি করে, আর যাত্রী জেনেশুনে এতে অংশ নিলে গুনাহগার হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না' *(আন-নিসা, ৪/২৯)*।

প্রশ্ন (২৩): বিকাশ, নগদে প্রাপ্ত রিওয়ার্ড পয়েন্ট ব্যবহার করা কি জায়েয? এটা ব্যবহার করলে কিছু টাকা পাওয়া যায়।

-মুস্তাকিম
ঝিনাইদহ।

উত্তর: বিকাশ বা নগদে লেনদেন করার পর যে রিওয়ার্ড পয়েন্ট বোনাস বা উপহার হিসেবে কোম্পানির পক্ষ থেকে পাওয়া যায়, তা ব্যবহার করে যে অর্থ বা সুবিধা পাওয়া যায়, তা গ্রহণ ও ব্যবহার করা জায়েয। কেননা তা হাদিয়া হিসেবে গণ্য হবে। আর হাদিয়া (উপহার) গ্রহণ করা জায়েয *(ছহীহ বুখারী, হা/২৫৮৫)*।

প্রশ্ন (২৪): আমার নাম আলমগীর। ইসলামে এ নাম রাখা কি জায়েয, নাকি পরিবর্তন করা জরুরী?

-মো. আলমগীর হোসেন
চারাবাগ, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

উত্তর: আলমগীর ফার্সি শব্দ। এর অর্থ হলো পৃথিবীর বাদশাহ বা পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক। এই ধরনের নাম রাখা উচিত নয়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলার কাছে কিয়ামতের দিনে ঐ লোকের নাম সবচেয়ে ঘৃণিত, যে তার নাম রেখেছে রাজাদের রাজা' *(ছহীহ বুখারী, হা/৬২০৬)*। নাম রাখা হয়ে গেলে তা পরিবর্তন করে সুন্দর অর্থবহ নাম রাখা উচিত। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকৃষ্ট নামসমূহ পরিবর্তন করে (ভালো নাম রেখে) দিতেন *(তিরমিযী, হা/২৮৩৯)*।

প্রশ্ন (২৫): আমার আপন ভাতিজি (বয়স ৪ বছর) আমাকে আব্বু বলে ডাকতে পারবে কি? বাবা না থাকায় তার জন্মনিবন্ধনে বাবার জায়গায় আমার নাম দিতে পারব কি?

-আলীনুর ইসলাম
জামালপুর।

উত্তর: শ্রদ্ধা ও সম্মান বিবেচনা করে চাচাকে আব্বু বলে সম্বোধন করা যায়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হে উমার! তুমি কি উপলব্ধি করছ না যে, কোনো ব্যক্তির চাচা তার পিতার সমতুল্য' *(ছহীহ মুসলিম, হা/২১৬৭)*। কিন্তু জন্মনিবন্ধনে পিতার জায়গায় চাচার নাম ব্যবহার করা জায়েয নয়। অভিভাবক হিসেবে নাম দেওয়া যায়; পিতা হিসেবে নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাকো; আল্লাহর কাছে এটাই অধিক ইনছাফপূর্ণ। অতঃপর যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই এবং তোমাদের বন্ধু' *(আল-আহযাব, ৩৩/৫)*। আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, 'কোনো লোক যদি নিজ পিতা সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও অন্য কাউকে তার পিতা বলে দাবি করে, তবে সে আল্লাহর কুফরী করল' *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৫০৮)*।

প্রশ্ন (২৬): ছোট বাচ্চাদের বানিয়ে বানিয়ে ভালো ভালো শিক্ষণীয় গল্প বলা যাবে কি? মূলত গল্পগুলো বাস্তবে ঘটেনি, কিন্তু শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

-মাহমুদা
ফেনী।

www.al-itisam.com

উত্তর: বানানো গল্পে যদিও শিক্ষণীয় বিষয় থাকে; কিন্তু সেটা বানানো, অবাস্তব বা মিথ্যা-ই হয়। এজন্য শিশুদেরকে এসব বানানো গল্প শোনানো উচিত নয়, যাতে করে তাদের শূন্যমস্তিষ্ক মিথ্যা বা বানানো গল্পের প্রভাবমুক্ত থাকে। রাসূল ﷺ বলেন, 'ওই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস! যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে। তার জন্য দুর্ভোগ!' *(আবূ দাঊদ, হা/৪৯৯০)*। রাসূল ﷺ বলেন, যে হাসির ছলেও মিথ্যা বলে না, আমি তার জন্য জান্নাতের মাঝে একটি প্রাসাদ বানানোর দায়িত্ব নিলাম' *(আবূ দাঊদ, হা/৪৮০০)*। নবী-রাসূল, ছাহাবী ও তাদের পরবর্তী মনীষীদের গল্প বা জীবনীতে যথেষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। শিশুদেরকে এসব গল্প আকর্ষণীয় উপস্থাপনার মাধ্যমে শোনানো যেতে পারে।

প্রশ্ন (২৭): মহিলা মাদ্রাসায় পুরুষ শিক্ষক শিক্ষকতা করতে পারবে কি? দলীলসহ জানাবেন।

-শাহীন
দিনাজপুর।

উত্তর: মহিলা মাদ্রাসায় পুরুষ শিক্ষক শর্তসাপেক্ষে শিক্ষকতা করতে পারবে। উল্লেখযোগ্য শর্ত হলো-

১. ফিতনামুক্ত পরিবেশ হতে হবে।
২. পর্দার আড়ালে থেকে দারস প্রদান করতে হবে।
৩. অপ্রয়োজনীয় কথা বলা যাবে না।
৪. ছাত্রীরা কোমল স্বরে বা আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলবে না *(আল-আহযাব, ৩৩/৩২, ৫৩; তাফসীরে কুরতুবী, ১৪/২২৭; ছহীহ বুখারী, হা/১০১)*। তবে বর্তমান ফিতনার যুগে মহিলা মাদ্রাসায় মহিলা শিক্ষিকা দ্বারাই পাঠ প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশ্ন (২৮): গরুর অণ্ডকোষ খাওয়া যাবে কি? অনেকে এটাকে মাকরূহ বলেছেন।

-হানযালা
ঢাকা।

উত্তর: গরুর অণ্ডকোষ খাওয়া জায়েয। কারো রুচি হলে সে খেতে পারে। অণ্ডকোষ খাওয়া অপছন্দনীয় সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো যঈফ *(সিলসিলা যঈফা, হা/৪২৯২)*।

প্রশ্ন (২৯): ফেসবুকে কোনো বুকশপ 'গিভওয়ে' আয়োজন করে, যেখানে অংশগ্রহণকারীদের পেজে ইনভাইট, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও বন্ধুদের মেনশন করার শর্ত দেওয়া হয়। এরপর লটারির মাধ্যমে কিছু বিজয়ীকে হাদিয়া দেওয়া হয়। এতে কোনো অর্থ লেনদেন নেই, তবে অংশগ্রহণকারীরা সময় ও শ্রম ব্যয় করে এবং পেজের প্রচার হয়। এ ধরনের গিভওয়ে আয়োজন ও এতে অংশগ্রহণ করা শরীআতসম্মত কি?

-সামিউল ইসলাম
গাইবান্ধা।

উত্তর: প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী ফেসবুকে কোনো বুকশপ (বইয়ের দোকান) কর্তৃক গিভওয়ে আয়োজন করা এবং এতে অন্যদের অংশগ্রহণ করা জায়েয। তবে শর্ত হলো উক্ত বুকশপের বইসমূহ এবং এর যাবতীয় কার্যক্রম ইসলাম বিরোধী না হওয়া। অন্যথায় এ গিভওয়েতে অংশগ্রহণ করা জায়েয হবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা কল্যাণকর কাজে সহযোগিতা করতে বলেছেন এবং গুনাহের কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন *(আল-মায়েদা, ৫/২)*।

প্রশ্ন (৩০): রুকইয়া করে অর্থ উপার্জন করা বা রুকইয়া করাকে কি পেশা হিসেবে গ্রহণ করা যাবে?

-নাসির উদ্দীন
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর: রুকইয়া একটি শরীআতসম্মত আমল, যা অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভসহ যেকোনো অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে কুরআন মাজীদের সূরা, আয়াত, হাদীছে বর্ণিত দু'আ ইত্যাদি পড়ে ঝাড়ফুঁক করার মাধ্যমে করা হয়। রাসূল ﷺ নিজে নিজের উপর রুকইয়া করতেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৪৪৩৯)* এবং ছাহাবীদের উপরও রুকইয়া করতেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৭১)*। ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম কারো চাহিদার ভিত্তিতে তার উপর রুকইয়া করেছেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৫০০৭)*। উল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, রুকইয়া একটি শরীআতসম্মত আমল। কিন্তু এটি কোনো পেশা বা অর্থ উপার্জনের মাধ্যম নয়। বরং রুকইয়ার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর অনুমোদিত পদ্ধতি অবলম্বন করে নিজে উপকৃত হওয়া এবং অন্যের উপকার করা। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেন, من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রুকইয়ার মাধ্যমে) তার ভাইকে উপকৃত করার সক্ষমতা রাখে, সে যেন অবশ্যই তা করে' *(ছহীহ মুসলিম, হা/২১৯৯)*। এ হাদীছ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, রুকইয়ার উদ্দেশ্য উপকার করা, অর্থ উপার্জন করা নয়। তবে রুকইয়ার উপর যদি কেউ স্বাভাবিক হাদিয়া প্রদান করে তা গ্রহণ করা যায়, নির্ধারিত ফি হিসেবে নয়। যেমন- কোনো এক গোত্রের সরদারকে সাপে কাটার পর এক ছাহাবী তার ঝাড়ফুঁক করলে তারা ছাগল হাদিয়া দিয়েছিল এবং ছাহাবীগণ তা গ্রহণ করেছেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৫০০৭)*।

বর্তমানে রুকইয়াকে কেন্দ্র করে যেসব অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে তা খুবই দুঃখজনক। এসব অসঙ্গতির মূল কারণ হলো রুকইয়াকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা। হিজরী প্রথম তিন শতাব্দী, যা হাদীছের ভাষ্যমতে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ তিন শতাব্দী, এই সময়ের মনীষীদের কেউ রুকইয়াকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। অথচ রুকইয়ার বিষয়টি নববী যুগ থেকে অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। এছাড়াও

www.al-itisam.com

যেসকল কারণে রুকইয়াকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা নাজায়েয তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. রুকইয়াকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলে এবং এটাকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম বানালে রুকইয়ার মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়। কারণ এর মূল উদ্দেশ্য হলো নিজে উপকৃত হওয়া এবং অন্যের উপকার করা *(ছহীহ মুসলিম, হা/২১৯৯)*।

২. বর্তমানে রাকীরা (রুকইয়াকারী) রুকইয়ার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের জন্য এতটাই উন্মাদ হয়ে গেছে যে, সাধারণ মানুষের কোনো সমস্যার কথা শুনলেই সেটাকে জিন বা জাদুর মিথ্যা প্রভাব হিসেবে দেখায় এবং ভয় দেখিয়ে ব্যক্তিকে আতঙ্কিত করে ফেলে। ফলে নিজের সুরক্ষা বিবেচনায় আতঙ্কিত ব্যক্তি ওই ভণ্ড রাকীর চাহিদামতো অর্থ প্রদানের জন্য রাজি হয়ে যায়। এভাবে তারা মানুষের সম্পদকে অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করছে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ‘তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না’ *(আল-বাকারা, ২/১৮৮)*।

৩. বর্তমানে রুকইয়ার মাধ্যমে মানুষের ঈমান হরণের এক মহড়া চলছে। ভণ্ড রাকী আতঙ্কিত ব্যক্তির বাসায় যাওয়া মাত্রই দাবি করছে, এই বাসায় প্রচুর জিন বাস করে অথবা এই বাসার প্রত্যেক সদস্যদের জাদু করা হয়েছে ইত্যাদি। অথচ এগুলোর গায়েবী বিষয়। সে নিজে গায়েব জানার দাবি করে নিজের ঈমান নষ্ট করার পাশাপাশি জনসাধারণকেও শিরকে নিমজ্জিত করছে। কত ভয়াবহ ব্যাপার! অথচ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কেউই গায়েব জানে না *(আন-নামল, ২৭/৬৫)*।

৪. কিছু নারীলিপ্সু লোক আছে, যারা নারীদের শ্লীলতাহানি ও ইযযত নষ্ট করার জন্য রুকইয়ার মতো একটি শারঈ আমলকে হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয়। কারণ নারীরা সরল। তাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে ভণ্ড রাকীরা টার্গেট করে নারীদের সম্ভ্রম নষ্ট করার পাশাপাশি তাদের সাজানো সংসার পর্যন্ত ভেঙে দিচ্ছে। এগুলো বাস্তব ঘটনা। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ‘তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কোনো অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না’ *(আল-আনআম, ৬/১৫১)*।

৫. বর্তমানে রুকইয়াকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে আল্লাহর বিধানকে খেলতামাশার বস্তুতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। প্রতারণা, উদ্ভট দাবি, মাত্রাতিরিক্ত ফি নির্ধারণ, বাসায় অবস্থানের শর্তারোপ করা ইত্যাদি যতসব কুকর্মের দ্বারা আল্লাহর বিধান ‘রুকইয়া’-কে খেলতামাশার বস্তু বানানো হচ্ছে, যা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, لَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ‘তোমরা আল্লাহর বিধানসমূহকে হাসিঠাট্টার বস্তু বানিয়ো না’ *(আল-বাকারা, ২/২৩১)*।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রুকইয়াকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা বা এটাকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম বানানো জায়েয নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিকটা বুঝার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন। তবে যারা সৎ নিয়্যতে শারঈ বিধিনিষেধ মেনে মানুষের সাথে ধোঁকাবাজি বা অসৎ পথ অবলম্বন না করে সত্য ও সঠিকভাবে রুকইয়া প্রদান করবে, তারা অবশ্যই এর বিনিময়ে আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদান পাবে।

প্রশ্ন (৩১): আমলের ফযীলতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ কি গ্রহণযোগ্য? ফযীলতের যঈফ হাদীছগুলোর উপর আমল করা যাবে কি?

-রেযওয়ান হাসান
মুন্সীগঞ্জ।

উত্তর: মূল প্রশ্নের উত্তর জানার পূর্বে এটা জানা জরুরী যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর মনোনীত বান্দাদের মাধ্যমে এত পরিমাণ ছহীহ হাদীছ আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন যে, যঈফ হাদীছের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। যঈফ হাদীছের প্রতি আমল করা যাবে না। কেননা ছাহাবী, তাবেঈ ও মুহাদ্দিছগণ যে সমস্ত মূলনীতি এবং শর্ত আরোপ করেছেন তাতে কোনো ক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইবনুল আরাবী মালেকী, ইবনু হাযম, ইবনু তায়মিয়্যাহ রহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছগণ সকল ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জন করেছেন *(ক্বাওয়াইদুত তাহদীছ, পৃ. ১১৩)*।

প্রশ্ন (৩২): এক নারী জিনে আক্রান্ত বলে ধারণা করা হচ্ছে। সুস্থ হওয়ার জন্য তিনি শিরকী-কুফরী তাবীয বা পদ্ধতি গ্রহণ করতে চান না। কিন্তু স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে এসব নিতে বাধ্য করছে; না নিলে সংসার ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এ অবস্থায় তার করণীয় কী?

-সুমাইয়া
বগুড়া।

উত্তর: জিনে আক্রান্ত হওয়ার ধারণা বেশিরভাগ অমূলক হয়। সামান্য অস্বাভাবিক আচরণ পরিলক্ষিত হলেই কিছু মানুষ মনে করে, জিনে আক্রান্ত হয়েছে। তবে যদি অতিমাত্রায় অস্বাভাবিক আচরণ পরিলক্ষিত হয়, তাহলে শারঈ রুকইয়া গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু কোনোভাবেই শিরকী তাবীয ইত্যাদি গ্রহণ করা যাবে না। এক্ষেত্রে স্বামী যদি জোর করে, তাহলে তার আনুগত্য করা যাবে না। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘কোনো আনুগত্য নেই গুনাহের কাজে’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৭২৫৭)*। স্বামী ও তার পরিবারের লোকদেরকে কোনো বিজ্ঞ আলেমের মাধ্যমে শিরকের পরিচয় ও ভয়াবহতা বুঝানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (৩৩): তিন বছর ধরে একটি পোষা পুরুষ বিড়াল ঘরে-ঘরে স্প্রে করে প্রস্রাব করে। পশুচিকিৎসকের মতে, নিউটার (প্রজনন ক্ষমতা অপসারণ) করালে সমস্যা দূর হবে। এ অবস্থায় বিড়ালকে নিউটার করানো শরীআতের দৃষ্টিতে জায়েয কি? এতে গুনাহ হবে কি? উল্লেখ্য, বিড়ালটি বাইরে দিয়ে আসলে আবার বাসায় আসে।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: পশু প্রাণীর উপর কোনো শারঈ বিধান নেই। কাজেই যে বিড়াল বাসায় থাকলে ক্ষতি হবে বা কোনো সমস্যা তৈরি হবে তাকে বাহিরে ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কেননা বিড়ালকে বাসায় রাখাটা জরুরী নয়।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৩৪): এখন ধানের মৌসুমে ধানের দাম কম থাকে, সে জন্য ধান কিনে রেখে ৩-৪ মাস পর দাম বাড়লে বিক্রয় করা বা স্টক ব্যবসা করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর: মানুষের ক্ষতি ও বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির উদ্দেশ্যে খাদ্য বা পণ্য স্টক করা হারাম *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৬০৫)*। তবে প্রশ্নে উল্লেখিত পদ্ধতিতে ধান সিজনে ক্রয় করে স্টক ব্যবসা করা জায়েয, যদি স্টক করার মাধ্যমে মানুষের ক্ষতিসাধন ও বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করা না হয় *(মাজমূউ ফাতাওয়া, ২৮/৭৫-৭৬)*। তবে অনেক সময় কিছু শস্য স্টক করাতেই কল্যাণ রয়েছে, যেমন- বিভিন্ন সবজি জাতীয় পণ্য।

প্রশ্ন (৩৫): কেউ যদি স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে বিদেশে যায় এবং সেখানে স্টুডেন্ট ভিসায় সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা কাজ করার অনুমতি থাকে, কিন্তু সে যদি অধিক আয় করার জন্য অতিরিক্ত হালাল পরিশ্রম করে; তাহলে এই অতিরিক্ত আয় কি তার জন্য হালাল হবে?

-জিহাদ
গাজীপুর।

উত্তর: যদি কোনো ব্যক্তি স্টুডেন্ট ভিসার শর্ত মেনে একটি দেশে প্রবেশ করে এবং ভিসার শর্তে সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা কাজের অনুমতি থাকে, তাহলে ইচ্ছাকৃতভাবে সেই সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়। অতিরিক্ত কাজটি হালাল হলেও চুক্তি ভঙ্গ ও আইন লঙ্ঘনের কারণে সে গুনাহগার হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ করো’ *(আল-মায়েদা, ৫/১)*। রাসূল ﷺ বলেন, ‘মুসলিমগণ তাদের শর্তাবলির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে’ *(আবূ দাউদ, হা/৩৫৯৪)*। যে ব্যক্তি কোনো দেশে নিরাপত্তা ও অনুমতি (ভিসা) নিয়ে প্রবেশ করে, তার উপর সেই দেশের সঙ্গে সম্পাদিত শর্তাবলি মেনে চলা আবশ্যক *(আশ-শারহুল মুমতে‘, ৮/৪৬১)*। সুতরাং তার অতিরিক্ত আয় হালাল হলেও, চুক্তি ভঙ্গ করা অনুচিত।

প্রশ্ন (৩৬): আমার একটি সেলুন আছে, যাতে বিভিন্ন লোকদের সুন্নাত পরিপন্থী চুল কাটতে ও দাঁড়ি শেভ করতে হয়। এই ইনকাম কি হালাল হবে?

-আ. রউফ
রাজশাহী।

উত্তর: দাঁড়ি মুণ্ডিয়ে দেওয়া বা সুস্পষ্ট হারাম স্টাইলে চুল কাটা হারাম ও গুনাহের কাজে সহযোগিতা করার শামিল *(আল-মায়েদা, ৫/২; ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৯২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৯)*। রাসূল ﷺ বলেন, «من تشبه بقوم فهو منهم» ‘যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই দলভুক্ত’ *(আবূ দাউদ, হা/৪০৩১)*। নবী ﷺ বলেছেন, «خالفوا المشركين» ‘তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ করো’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৯২)*। আল্লাহ তাআলা যে জিনিস থেকে উপকৃত হওয়া হারাম করেছেন, তার বিনিময়ে মূল্য বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করাও হারাম *(মাজমূউ ফাতাওয়া, ২৯/২২-২৩)*। সুতরাং দাঁড়ি মুণ্ডিয়ে বা সুস্পষ্ট হারাম স্টাইলে চুল কাটার পারিশ্রমিক হালাল হবে না। তবে সাধারণভাবে চুল কাটার পারিশ্রমিক হালাল।

প্রশ্ন (৩৭): একটি অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ করি, যেখানে টিকিট বুকিং করে কমিশন পাওয়া যায়। তবে কাজ শুরু করতে আগে নিজের টাকা (ন্যূনতম ১০,০০০ টাকা) জমা/রিচার্জ করতে হয়, আর বেশি টাকা জমা দিলে আয়ও বাড়ে। যেমন- ১০০০০ টাকা জমা দিয়ে এর বিপরীতে আমি ৭৫টি টিকেট বুকিং করলে ১৫০০-২০০০/- গড়ে উপার্জন করে থাকি। এই ধরনের আয় ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল হবে কি?

-মেহেদী হাসান শাকিল
ফুলতলা-চৌড়হাস, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।

উত্তর: ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ করার জন্য শুরুতেই কোনো ট্রাভেল ফ্র্যাঞ্চাইজির মেম্বারশিপ বা সদস্যপদ ক্রয় বাবদ যে অর্থ প্রদানের শর্তারোপ করা হয়, তা বৈধ নয় এবং এই অর্থ প্রদান ঘুষ প্রদানের নামান্তর। আব্দুল্লাহ বিন আমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ঘুষদাতা এবং ঘুষগ্রহীতার প্রতি অভিসম্পাত করেছেন *(আবূ দাউদ, হা/৩৫৮০)*। তবে টিকেট বুকিং বৈধ কাজ। এক্ষেত্রে শ্রম দেওয়া এবং এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক, কমিশন ও বোনাস গ্রহণ করা বৈধ *(ছহীহ বুখারী, ৩/৯৩; আল-মুগনী, ৫/৩৪৫)*।

www.al-itisam.com

পারিবারিক জীবন

প্রশ্ন (৩৮): বিয়ের দিন নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর কোনো মেয়েপক্ষ যদি তার থেকে অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকেও ভালো কোনো ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিতে চান, তাহলে সেটা শরীআত সম্মত কাজ হবে কি?

-জাকিরুন খাতুন
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: ইসলামী শরীআত মুসলিম ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর নতুন করে প্রস্তাব দেওয়া কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন তার মুসলিম ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়' *(ছহীহ বুখারী, হা/৫১৪২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪১২)*। তবে বিবাহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ইস্তিখারা করতে হবে। তারপরেও এমন ঘটনার সম্মুখীন হলে আবারও ইস্তিখারা করা উচিত। কেননা আমরা মানুষ হিসেবে যাকে ভালো মনে করছি বাস্তবে সে তেমন নাও হতে পারে। আবার আমাদের ধারণায় নেতিবাচক কেউ ভালো হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা যা অপছন্দ কর, হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালোবাস, হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর' *(আল-বাকারা, ২/২১৬)*। তাই মেয়েপক্ষের সম্মতির পর অন্য কারো নতুন প্রস্তাব দেওয়া হারাম; যতক্ষণ না প্রথম প্রস্তাবকারী তার প্রস্তাব উঠিয়ে নেবে বা তাকে অনুমতি দেবে *(ছহীহ বুখারী, হা/৫১৪২; শারহু ছহীহ মুসলিম, ৯/১৯৭)*। তবে যদি প্রথম পাত্র সম্পর্কে নতুন করে কোনো শারঈ ত্রুটি, যেমন- দ্বীনের দুর্বলতা, চরিত্রগত সমস্যা, প্রতারণা ইত্যাদি জানা যায়, তাহলে মেয়ের স্বার্থে বিয়ের কথা বাতিল করা জায়েয। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যখন এমন কোনো ব্যক্তি তোমাদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার দ্বীনদারিতা ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, তখন তার সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন করে দাও। যদি তোমরা তা না কর, তবে পৃথিবীতে ফিতনা ও ব্যাপক বিপর্যয় (অরাজকতা) সৃষ্টি হবে' *(তিরমিযী, হা/১০৮৪; ইবনু মাজাহ, হা/১৯৬৭)*। আর শুধু অর্থনৈতিকভাবে সম্পদশালী হওয়া শরীআতের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় নয়। সুতরাং শারঈ কোনো ত্রুটি না থাকলে কেবল অধিক ধনী বা তুলনামূলক ভালো পাত্রের জন্য পূর্বনির্ধারিত বিয়ে বাতিল করা ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী, যাতে ওয়াদা ভঙ্গ হয়।

প্রশ্ন (৩৯): তালাক হয়েছে কিনা সন্দেহে ছিলাম। এরপর সব হিসাব করে স্ত্রীকে সেইফ থাকার জন্য ওয়ার্নিং দিয়ে বলেছিলাম, 'একটি কিন্তু হয়ে গেছে, সাবধানে থাকবে'। এখন জানতে পারলাম আগেরটা হয়নি। তাহলে কি একটি হয়ে যাবে?

-তামজীদ
জামালপুর।

উত্তর: স্বামী সন্দেহের কারণে স্ত্রীকে সতর্ক করার উদ্দেশ্য 'একটি কিন্তু হয়ে গেছে, সাবধানে থাকবে' এভাবে বলাতে তালাক পতিত হবে না। কেননা তালাক শব্দ বলার মাধ্যমেই তালাক পতিত হয়। আর সংবাদ দেওয়া বা অতীত ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে তালাক সংঘটিত হয় না *(মাজমূউ ফাতাওয়া, ৩৩/৮১-৮৩)*।

প্রশ্ন (৪০): আমার বাবা-মা কয়েক বছর আগে ডিভোর্স করেছেন। বর্তমানে আমি মায়ের সঙ্গে থাকি। বাবা চান আমি তার কাছে গিয়ে থাকি, কিন্তু মা এতে রাজি নন। আমার আর্থিক সামর্থ্যও সীমিত, তাই কাউকেই উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করতে পারছি না। এখন কার কথা শুনব?

-জুবায়ের মাহবুব জাবেদ
উপশহর, সিলেট।

উত্তর: এমতাবস্থায় মায়ের সাথেই থাকবে এবং পিতার সাথে সদাচারণ বজায় রাখবে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট থেকে কে সর্বোত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী? তিনি বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, 'তোমার বাবা' *(ছহীহ মুসলিম, হা/৬৩৯৪)*। তবে পিতার সাথে থাকা যদি উভয়ের জন্য বেশি কল্যাণকর হয়, তখন পিতার সাথে থাকবে আর মাতার সাথে সদাচারণ করবে এবং তাকে সান্ত্বনা দিবে।

প্রশ্ন (৪১): একজন নারীর ২৩ মাস বয়সী একটি সন্তান রয়েছে। তিনি শারীরিকভাবে অনেক দুর্বল এবং বর্তমানে গর্ভধারণের এক সপ্তাহ বা কিছু বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। পরিবার আশঙ্কা করছে যে, নতুন গর্ভধারণ মা ও দুগ্ধপোষ্য সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এ অবস্থায় শরীআতের দৃষ্টিতে এই প্রাথমিক পর্যায়ে গর্ভপাতের অনুমতি আছে কি?

-সাদেকুর রহমান
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর: ইসলামী শরীআতে গর্ভপাত করানো হারাম *(বনী ইসরাঈল, ১৭/৩১)*। প্রশ্নে বর্ণিত গর্ভবতী মা ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি নিয়ে যে আশঙ্কা করা হচ্ছে, শুধুমাত্র এই আশঙ্কার ভিত্তিতে গর্ভপাত করানো জায়েয হবে না; যদিও তা গর্ভধারণের প্রাথমিক পর্যায় হয়। তাই তাক্বওয়ার দাবি এটাই যে, গর্ভপাত করাবে না। তবে নিরুপায় হলে ভিন্ন বিষয়।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (৪২): আমি আমার স্ত্রীকে প্রথমে এক তালাক দিই। এরপর ২ মাস ২০ দিন পর পারিবারিক মনোমালিন্যের কারণে তাকে আরেকবার তালাক দিই এবং তখন থেকে আমরা আলাদা থাকি। এ সময় আমার স্ত্রী অন্য কোথাও বিবাহ করেনি। পরবর্তীতে প্রায় ১০ মাস পর স্ত্রীর পক্ষ থেকে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে খোলা তালাক নেওয়া হয়। আমি শুনেছি, খোলা তালাকের পর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং পুনরায় সংসার করতে চাইলে নতুন মোহরানা ও সাক্ষীসহ নতুন করে বিবাহ করতে হয়। এখন আমার প্রশ্ন হলো, যদি আমরা নতুন করে বিবাহ করি, তাহলে পূর্বের দেওয়া দুই তালাক কি বহাল থাকবে, নাকি নতুন বিবাহের মাধ্যমে তালাকের হিসাব নতুনভাবে শুরু হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী উক্ত স্বামীর পক্ষ থেকে দুই তালাক সংঘটিত হয়েছে। দুই তালাকের পর তিন মাস অতিক্রম হয়ে যাওয়ায় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। আর ১০ মাস পরে স্ত্রীর পক্ষ থেকে খোলা তালাকের কোনো কার্যকারিতা নেই। কেননা তখন তারা স্বামী-স্ত্রী ছিল না। এখন তারা চাইলে নতুন করে বিবাহে আবদ্ধ হতে পারেন। মাকিল ইবনু ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বোনকে তার স্বামী তালাক দিয়ে তারপর পৃথক করে রাখে। যখন ইদ্দত পালন পূর্ণ হয়, তখন তার স্বামী তাকে আবার পয়গাম পাঠায়। মাকিল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অমত পোষণ করলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ‘তারা তাদের স্বামীর সাথে পুনরায় বিধিমত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে চাইলে তাদের তোমরা বাধা দিয়ো না’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৪৫২৯)*। তবে নতুন বিবাহের পর তালাকের হিসাব নতুনভাবে শুরু হবে না, বরং পূর্বের দুই তালাক বিবেচনায় থাকবে। অতএব, যদি পরবর্তীতে আরেক তালাক প্রদান করা হয়, তাহলে মোট তিন তালাক কার্যকর হয়ে যাবে *(আল-বাকারা, ২/২২৯; মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়্যাহ, ৩২/২৮৯)*।

উত্তরাধিকার বিধান

প্রশ্ন (৪৩): স্ত্রীর দেনমোহর বাকি রেখে স্বামী মারা যায়। তাহলে এটা কি স্ত্রীকে মাফ করে দিতে হবে নাকি স্বামীর সম্পদ থেকে নিবে? সম্পদ না থাকলে কি করবে?

-মুনয়িমা
কুমিল্লা।

উত্তর: দেনমোহর আল্লাহ প্রদত্ত স্ত্রীর হক্ব, স্ত্রীকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা ফরয *(আন-নিসা, ৪/২৪)*। মোহর স্বামীর উপর ঋণ, সে মারা গেলে অন্যান্য ঋণের মতো তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে প্রথমে তা আদায় করতে হবে *(মাজমূউ ফাতাওয়া, ৩২/২১০-২১১; আল-মুগনী, ৭/১৫৬)*। তবে সম্পদ না থাকলে স্ত্রী চাইলে মাফ করতে পারেন *(আল-বাকারা, ২/২৮০)*।

প্রশ্ন (৪৪): স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চাকরিজীবী। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের টাকায় যৌথভাবে কেনা সংসারের কিছু জিনিসপত্র রয়েছে এবং স্ত্রী তার স্বামীর পরিবার থেকে কিছু উপহারসামগ্রী পেয়েছে। এখন যদি স্ত্রী মারা যায়, তাহলে কি এসব জিনিসপত্র ও উপহারসামগ্রী উত্তরাধিকারসূত্রে বণ্টন করতে হবে?

-ফিরোজ
ঢাকা।

উত্তর: স্ত্রী যে উপহারসামগ্রী পেয়েছে সেগুলোর মালিক সে নিজেই। সুতরাং তার মৃত্যুর পর এগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে বণ্টন করা হবে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে যেসব জিনিসপত্র ক্রয় করেছে এবং তাদের কাউকে নির্দিষ্টভাবে মালিক বানানো হয়নি, সেগুলোর মালিক শুধু স্ত্রী নয়; বরং উভয়েই যৌথভাবে মালিক। সুতরাং স্ত্রীর মৃত্যুর পর শুধুমাত্র তার মালিকানাধীন অংশে তার ওয়ারিছদের অধিকার সাব্যস্ত হবে।

নারী সংক্রান্ত

প্রশ্ন (৪৫): আমাদের গ্রামে মহিলাদের মাহফিলে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দু‘আ, তাফসীর, বিভিন্ন বই থেকে আলোচনা হয়। তাদের উদ্দেশ্য ভালো। সেক্ষেত্রে মহিলারা এমন মাহফিলে অংশগ্রহণ করতে পারবে কি?

-মো. সামসুদ্দিন
শীতল মাঠ, পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর: কোনো নির্দিষ্ট স্থানে পর্দার পরিবেশে স্থানীয় মহিলারা তা‘লীমী বৈঠকের আয়োজন করতে পারে। কিন্তু বর্তমানে কিছু এলাকায় মহিলা মাহফিলের যে প্রচলন শুরু হয়েছে তা একাধিক কারণে জায়েয নয়। যেমন-

১. মহিলা বক্তার আওয়াজ মাইক ও লাউডস্পিকারের মাধ্যমে মাহফিল সংলগ্ন এলাকার পরপুরুষদের কানে পৌঁছানো হচ্ছে। অথচ নারীদের কণ্ঠেরও পর্দা রয়েছে *(আল-আহযাব, ৩৩/৩২)*।

২. এসব মাহফিলে অনেক মহিলা স্বামী বা মাহরাম ছাড়া দূর থেকে সফর করে আসে। অথচ একজন নারীর জন্য স্বামী বা মাহরাম ছাড়া সফর করা জায়েয নয় *(ছহীহ বুখারী, হা/১১৯৭)*।

৩. সাধারণ মাহফিলে পুরুষেরা মহিলাদের নিরাপত্তা ও পর্দার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফলে ফিতনার আশঙ্কা কম থাকে। পক্ষান্তরে মহিলা মাহফিলের সার্বিক দায়িত্ব মহিলারাই পালন করে থাকে। ফলে তাদের নিরাপত্তা ও পর্দা লঙ্ঘিত হয় এবং

www.al-itisam.com

ফিতনার প্রবল আশঙ্কা থাকে। মহিলাদের দাওয়াতী কাজের জন্য কোনো আয়োজনের প্রয়োজন হলে পুরুষ আলোচক আছেন এমন মাহফিলে পুরুষদের আয়োজনের সাথে মহিলাদের পর্দার সাথে বসার আয়োজন করতে পারে।

কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪৬): গায়রত কী? গায়রত কি কখনো ব্যক্তিকে অহংকারী করে তোলে?

-মিহাদ হাসান
মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তর: গায়রত (আত্মমর্যাদা) হলো নিজের সাথে সম্পৃক্ত কোনো বিষয়ে অন্যের অংশগ্রহণকে অপছন্দ করা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিষয়গুলোতে এটা অতিমাত্রায় বিদ্যমান থাকে *(তুহফাতুল আহওয়াযী, ৪/২৭৭)*। গায়রত (আত্মমর্যাদা) ব্যক্তিকে অহংকারী বানায় না। বরং গায়রত (আত্মমর্যাদা) ভালো গুণ। হাদীছে এটাকে মুমিনের গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৬১)*। বিশিষ্ট ছাহাবী সা'দ বিন উবাদাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যদি কোনো পুরুষকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখতাম, তাহলে তাকে (সেই পুরুষকে) তরবারির ধারালো অংশ দিয়ে আঘাত করতাম। তার এই বক্তব্য রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছানো মাত্রই রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা কি সা'দ এর গায়রত (আত্মমর্যাদা) দেখে অবাক হচ্ছ? অবশ্যই আমি তার চেয়েও অধিক গায়রতসম্পন্ন এবং আল্লাহ তাআলা আমার চেয়ে অধিক গায়রতসম্পন্ন' *(ছহীহ বুখারী, হা/৬৮৪৬)*। মূলত অহংকারের সংজ্ঞা না জানার কারণে কিছু মানুষ গায়রতকে (আত্মমর্যাদা) অহংকার মনে করে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষায় অহংকারের সংজ্ঞা হলো, 'সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা' *(ছহীহ মুসলিম, হা/৯১)*।

প্রশ্ন (৪৭): আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে, গরু/ছাগলের বাচ্চা হলে তাদের গর্ভফুল বের করার জন্য পুঁইশাকের ডাল গলায় ঝুলিয়ে দেয়। এটা কি করা যাবে?

-আসাদুজ্জামান
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর: গরু/ছাগলের বাচ্চা হলে তাদের গর্ভফুল বের করার জন্য পুঁইশাকের ডাল গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া একটি কুসংস্কার ও শিরকী কাজ। এর পক্ষে ইসলাম বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোনো নির্দেশনা নেই।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৮): এক লোককে আমি পছন্দ করি না। কিন্তু তার সাথে খারাপ ব্যবহারও করি না। দেখা হলে হেসেই কথা বলি। এর কারণে কি আমি মুনাফিক হব?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: কাউকে অপছন্দ করার পরেও তার সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে ভালোভাবে কথা বলা মুনাফেকী নয়; বরং হাদীছে উত্তম কথা বলাকে ছাদাকা বলা হয়েছে *(ছহীহ বুখারী, হা/২৮৯১)* এবং হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাকে ভালো কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৬২৬)*। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি লোকটিকে দেখে বললেন, 'সে গোত্রের নিকৃষ্ট লোক'। এরপর সে যখন এসে কথা বলল, তখন নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দ সহকারে হাস্যোজ্জ্বল মুখে তার সাথে মেলামেশা করলেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৬০৩২)*।

প্রশ্ন (৪৯): আমার এক আন্টির স্বামী ইন্তেকাল করেছে প্রায় ছয় মাস পূর্বে। আন্টি স্বপ্নে দেখেছেন, তিনি আর মাত্র কিছুদিন বাঁচবেন। এই অবস্থায় তিনি অনেক ভয় পাচ্ছেন। প্রশ্ন হলো ইসলামে স্বপ্নের বাস্তবতা কী? সব স্বপ্নের কি নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা আছে?

-শেখ বায়েজিদ হোসেন
বাগেরহাট।

উত্তর: ক. হাদীছের ভাষ্যমতে স্বপ্ন তিন ধরনের হয়- ১. ভালো স্বপ্ন, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ হয়ে থাকে। ২. মন্দ স্বপ্ন, যা শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতিপ্রদর্শন হয়ে থাকে। ৩. মস্তিষ্কপ্রসূত স্বপ্ন অর্থাৎ মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যা ভাবে বা করে সেগুলো স্বপ্নে দেখে *(ছহীহ মুসলিম, হা/২২৬৩)*। এই হাদীছ থেকে বুঝা যায়, সকল স্বপ্ন অমূলক নয় এবং স্বপ্নের ভালো ও মন্দ দুটি দিকই রয়েছে।

তবে এক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা হলো যদি ভালো স্বপ্ন হয়, তাহলে এমন ব্যক্তির কাছে তা প্রকাশ করা যাবে, যাকে স্বপ্নদ্রষ্টা পছন্দ করে এবং সে তার কল্যাণকামী *(ছহীহ মুসলিম, হা/২২৬১)*। হিংসুক ব্যক্তির কাছে ভালো স্বপ্নের বিবরণ প্রকাশ করা যাবে না *(ইউসুফ, ১২/৫)*। আর যদি মন্দ স্বপ্ন হয়, তাহলে তা প্রকাশ করতে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন এবং যেটা করণীয় তা বলে দিয়েছেন। করণীয় হলো, মন্দ স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙার পর তাৎক্ষণিক বাম দিকে তিন বার থুতু ফেলা এবং শয়তান ও স্বপ্নের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা, আর দুই রাকআত ছালাত আদায় করা *(ছহীহ মুসলিম, হা/২২৬১)*।

খ. ভালো স্বপ্নের ব্যাখ্যা আছে। তবে যাকে-তাকে তা জিজ্ঞেস করা যাবে না। কারণ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারা আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা, এটা মেহনত করে অর্জন করা কঠিন। যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালাম -এর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘এবং যাতে আমি তাকে (ইউসুফকে) শিক্ষা দিই স্বপ্নের ব্যাখ্যা’ *(ইউসুফ, ১২/২১)*। সুতরাং স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করার পূর্বে ব্যক্তিকে ভালোভাবে যাচাই করতে হবে। এক্ষেত্রে বিখ্যাত স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী ও তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন রাহিমাহুল্লাহ -এর গুণাবলিকে মানদণ্ড হিসেবে রাখা যেতে পারে। উল্লেখ্য, স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী যা বলবেন তাই চূড়ান্ত নয়।

প্রশ্ন (৫০): জনৈক মা তার সন্তানকে কারণে-অকারণে অভিশাপ দিয়ে থাকে। তাকে অভিশাপ দিতে নিষেধ করলেও শোনে না। এক্ষণে অভিশাপের ক্ষতি যেন সন্তানের জীবনে না আসে সেজন্য করণীয় কী?

-আবূ হুরায়রা সিফাত
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর: ইসলাম সন্তান ও সম্পত্তির উপর অভিশাপ দিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে, সন্তানদের বিরুদ্ধে এবং সম্পদের বিরুদ্ধে বদদু‘আ (অভিশাপ) করো না। এমন সময়ের সাথে তা মিলে যেতে পারে যখন আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া হলে তিনি তা কবুল করেন’ *(ছহীহ মুসলিম, হা/৩০০৯)*। সন্তানের বিরুদ্ধে পিতামাতার দু‘আ কবুল হয়, এজন্য পিতামাতার কখনো সন্তানের বিরুদ্ধে বদদু‘আ করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তিন ব্যক্তির দু‘আ নিঃসন্দেহে কবুল হয়, তার মধ্যে রয়েছে সন্তানের বিরুদ্ধে পিতামাতার দু‘আ’ *(আবূ দাঊদ, হা/১৫৩৬; তিরমিযী, হা/১৯০৫)*। তবে অন্যায় বদদু‘আ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আপনার রব কারও প্রতি যুলুম করেন না’ *(আল-কাহফ, ১৮/৪৯)*। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘বান্দার দু‘আ সর্বদা গৃহীত হয়, যদি সে পাপের কাজ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করার জন্য দু‘আ না করে এবং (দু‘আয়) তাড়াহুড়া না করে’ *(ছহীহ মুসলিম, হা/৬৮২৩)*। এমন পরিস্থিতিতে সন্তানের জন্য করণীয়- ১. মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখা *(আল-ইসরা, ১৭/২৩)*। ২. বদদু‘আর জবাবে বদদু‘আ না করা। ৩. নিয়মিত এই দু‘আ পড়া, حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم *(আবূ দাঊদ, হা/৫০৮১)*। ৪. সকাল-সন্ধ্যার মাসনূন যিকির ও দু‘আ পাঠ করা। বিশেষত, بسم الله اللذي لايضر مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ *(তিরমিযী, হা/৩৩৮৮; আবূ দাঊদ, হা/৫০৮৮)*।

সম্পাদকীয়র বাকি অংশ

বাংলাদেশের পোশাক খাতের জন্য এটি অনিবার্য ছিল। কেননা আমাদের রপ্তানি খাতের ৮৬ শতাংশই পোশাক রপ্তানি। আর এই পোশাকের বড় অংশই রপ্তানি হয় আমেরিকায়। প্রতিবছর প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলারের পোশাক আমেরিকায় রপ্তানি হয়।

তবে পোশাক খাত বাঁচাতে গিয়ে এই চুক্তিতে এমন অনেক বিষয় সংযুক্ত করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির জন্য হুমকিস্বরূপ। যেমন, পারমাণবিক ক্ষেত্রে এবং সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য হুমকি—এমন কোনো দেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারবে না। আর আমেরিকার নিরাপত্তার হুমকির তালিকায় চীন ও রাশিয়া স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে।

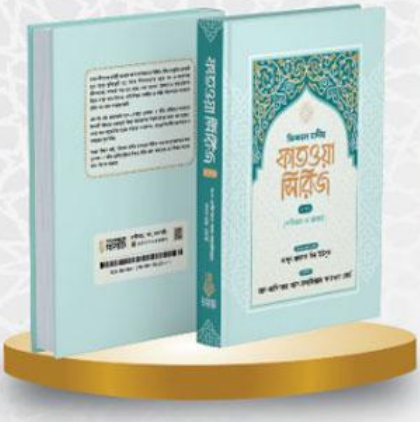
এই যে বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে দুই পরাশক্তির দ্বন্দ্ব, এর বলি হচ্ছে রোহিঙ্গা সংকট ও বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম। একদিকে জান্তা সরকার ও বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর গৃহযুদ্ধে রক্তাক্ত মিয়ানমার। তন্মধ্যে আরাকান আর্মি, আরএসও (RSO) ইত্যাদি সশস্ত্র গোষ্ঠীর বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে যাতায়াত রয়েছে। পাশাপাশি কুকি-চিন ও ইউপিডিএফের মতো সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোও পার্বত্য চট্টগ্রামে সক্রিয় রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় ১১টি নৃগোষ্ঠী রয়েছে, যাদের অধিকাংশই অতি দ্রুততার সঙ্গে খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে এবং হচ্ছে। ভারতের কিছু রাজ্য ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাগুলো মিলিয়ে একটি খ্রিষ্টান রাষ্ট্র তৈরির পরিকল্পনার কথাও অনেক আলোচিত ও সমালোচিত। ফলে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগ বহুমুখী সংঘাতের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হচ্ছে। মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠী, জান্তা সরকার, বিতাড়িত রোহিঙ্গা, পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং ইন্দো-প্যাসিফিককে কেন্দ্র করে চীন ও আমেরিকার স্নায়ুযুদ্ধ—সব মিলিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব উভয়ই হুমকির মুখে।

বাংলাদেশ সরকারের উচিত বিভিন্ন ইসলামী ফাউন্ডেশন ও সংস্থাগুলোকে ব্যাপকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে দাওয়াতী কাজ ও সেবামূলক কাজ করার সুযোগ দেওয়া। দাওয়াতের মাধ্যমে, সেবা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অবশ্যই তাদের মুসলিম বানানো সম্ভব। তারা যদি নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হতে পারে, তাহলে ইনশা-আল্লাহ মুসলিমও হতে পারবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের ইসলামের সঙ্গে ব্যাপকভাবে পরিচিত করা ছাড়া বাংলাদেশের অখণ্ডতা ধরে রাখার আর দ্বিতীয় কোনো কার্যকর রাস্তা নেই।

পাশাপাশি রাখাইন রাজ্যে মুসলিম অধ্যুষিত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এজন্য যেকোনো মূল্যে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে হবে। তাহলে বাংলাদেশের সীমান্তসংলগ্ন রাখাইনেও মুসলিম-প্রধান অঞ্চল থাকলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি অনেকাংশে কমে যাবে, ইনশা-আল্লাহ। (প্র. স.)

মাকতাবাতুস সালাফ



ফিকহুল হাদীছ ফাতওয়া সিরিজ

সংকলনে: আল-জামিআহ আস সালাফিয়্যাহ ফাতওয়া বোর্ড
বোর্ড প্রধান: আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

ইসলামী জীবনের প্রথম শর্ত পবিত্রতা, আর তার সর্বোচ্চ প্রকাশ সালাত। এই দুই ইবাদতের শুদ্ধতা ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। "ফিকহুল হাদীস ফাতওয়া সিরিজ"-এর এই প্রথম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে আল-ইতিছাম-এ প্রকাশিত দলিলভিত্তিক ফাতওয়াগুলোর বাছাইকৃত অংশ, সাথে সংযোজিত হয়েছে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ও সমসাময়িক বিষয়।

পুরো গ্রন্থজুড়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে পবিত্রতা ও সালাত-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণ্য উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে। ওযু, গুসল, নাপাকি, মহিলাদের মাসিক অবস্থা, সালাতের রুকন ও শর্ত, জামাআত, ইমামতি, ভ্রমণকালীন নামায-সবই এখানে সাজানো হয়েছে দলিল ও ফিকহি বিশ্লেষণের আলোকে।

এই সংকলন পাঠককে ইবাদতের সঠিক অনুশীলনে সহায়ক ও শরঈ নির্দেশনা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে, ইনশাআল্লাহ।

মূল্য: ~~৫৮০৳~~ ৫২০৳

মাসিক আল-ইতিছামের সম্মানিত গ্রাহক-এজেন্টগন পাচ্ছেন ১০% ছাড়ে।

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী। ০১৪০৭-০২১৮৪৭ MaktabatusSalaf

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বরসমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য
মক্তব ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

যাকাতের জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন | আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

Monthly Al-Itisam الاعتصام, August 2026, Price : 30.00

بسم الله الرحمن الرحيم

সালাফী কনফারেন্স ২০২৬-২৭

অনুষ্ঠানের সময়সূচি

১০ম বার্ষিক রাজশাহী

১২ ও ১৩ নভেম্বর, ২০২৬ ইং

স্থান

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গন, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

৬ষ্ঠ বার্ষিক দিনাজপুর

১৮ ডিসেম্বর, ২০২৬

স্থান

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গন, তেঘরা, বিরল, দিনাজপুর

১০ম বার্ষিক নারায়ণগঞ্জ

২৮ ও ২৯ জানুয়ারি, ২০২৭ ইং

স্থান

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গন, বীরহাটাব-হাটাব, বীরবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

সভাপতিত্ব করবেন

শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন; মহাপরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বাংলাদেশ

বক্তব্য পেশ করবেন:

সালাফী মানহাজের অনুসারী বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম

আয়োজনে: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
রাজশাহী, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ। মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

বাস্তবায়নে: আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ
ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী। মোবা: ০১৪০৭-০২১৮১৫